# শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু চর্চা

অজয় বসু

ডঃ অমিয়কুমার হাটি



୪୨୮ //

୭୮୭

# শিশুস্বাস্থ্য ও শিশু চর্চা

অজয় বসু
ডাঃ অমিয়কুমার হাটি

মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স
১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

# SHISHU SWASTHYA SHISHU CHARCHA

by

AJOY BASU

Dr. AMIYA KUMAR HATI

প্রকাশক ঃ শ্রী সুধীর কুমার মণ্ডল
১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বনশ্রী বসু

প্রথম সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা ১৯৮৭

বিনিময় মূল্য ঃ পনেরো টাকা

Acc no-16645

মুদ্রক ঃ স্বর্ণলতা ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

## প্রাসঙ্গিকী

শিশু জাতির সম্পদ। কোন দেশ কতখানি উন্নতি করেছে, জানা যায় সে দেশের শিশুরা কেমন অবস্থায় আছে তা দেখে। শিশুস্বাস্থ্যের বিষয়টি তাই এখন আর শুধু পারিবারিক অথবা একান্তভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিষয়ই নয়, এটি একটি সামাজিক সমস্যাও। এই গ্রন্থে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাথমিক পরিচর্যা প্রসঙ্গে শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাচর্চার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে নানা ভ্রান্ত ধারণা, বিশ্বাস ও কুসংস্কার যাতে দূর হয় সে চেষ্টাও করা হয়েছে। শিশুপালনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে সেই সব বাবা-মা ও অভিভাবকের সঙ্গে যাঁরা সমাজে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে নানাভাবে জড়িত তাঁদের শিশুচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই গ্রন্থ যদি এঁদের সকলের কিছুটাও কাজে লাগে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থখানি প্রকাশে সবিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল মহাশয়কে।

অজয় বসু
ডাঃ অমিয়কুমার হাটি

আজকের নবজাতক, আগামী দিনের প্রজন্মের শুভকামনায় উৎসর্গিত হল ॥

## • বিষয় বিন্যাস •

## ॥ শিশুস্বাস্থ্যের বাস্তব পটভূমি ॥

### স্বাস্থ্য কি ?

শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে যে কোনো আলোচনার সূচনায় 'স্বাস্থ্য' বলতে কি বোঝায় সে-বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই শব্দটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রায় অবিকৃত। 'স্থা' বলতে বোঝায় 'থাকা'। 'স্বস্থ' বা 'সুস্থ' অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ভালো থাকার অবস্থাকেই এক কথায় স্বাস্থ্য বলা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবান বলতে আমরা তাকেই বোঝাই যে স্বাভাবিক এবং সুস্থ বা ভালো আছে। এই সুস্থতা কেবল শারীরিক নয়, শারীরিক ও মানসিক উভয়ত।

কোন শব্দ লোকমুখে বহু প্রচলিত হওয়ার ফলে তার অর্থের যেমন ব্যাপকতা ঘটে তেমনি কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। স্বাস্থ্য কথাটির বেলাতেও এমন হতে দেখা যায়। স্বাস্থ্য বলতে কখনও বুঝি নীরোগ শরীর, কখনও বা পরিপুষ্টতা ; আবার কখনও শুধু শরীরের অবস্থা বোঝাতেও জিজ্ঞাসা করি, 'অমুকের স্বাস্থ্য কেমন আছে ?' কোন জায়গা যখন 'স্বাস্থ্যকর' তখন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জায়গাটা স্বাভাবিক ও ভালো থাকার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে শুধুই 'স্বাস্থ্যের অধিকারী' বললে কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায় ; তাই বলি, তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

রোগের উপসর্গ যেমন রোগ নয় তেমনি স্বাস্থ্যের লক্ষণমাত্রই স্বাস্থ্য নয়।

### স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা ঃ

স্বাস্থ্য জীবনেরই অভিব্যক্তি। আমাদের সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি ও জটিলতা আমাদের স্বাস্থ্য-ভাবনাতেও

বিবর্তন এনেছে। রোগহীনতা যদিও স্বাস্থ্যের অন্যতম লক্ষণ তবু স্বাস্থ্য বলতে শুধু রোগহীনতাকেই বোঝায় না। বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাস্থ্যসংস্থা, যাকে বলা হয় World Health Organisation বা বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য বলতে আমরা আগে যে ভালো থাকার কথা আলোচনা করেছি, বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী তা শুধু শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেই 'ভালো থাকা' নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও 'ভালো থাকা'—economic and social well-being। আমাদের ভালো থাকার প্রকৃতি কিরকম হওয়া উচিত, এই সংজ্ঞা তা স্পষ্টই নির্দেশ করছে। আমাদের স্বাস্থ্যভাবনার এই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যই আধুনিক স্বাস্থ্য-সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। যে জীবনের পূর্ণতার জন্য শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ একান্ত প্রয়োজন সেই জীবনের সঙ্গে জীবিকা ও সমাজের অবিচ্ছিন্ন যোগ। তাই শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ যদি কোন কারণে বাধা পায় তাহলে সেই অস্বাস্থ্যের দুর্ভোগ শুধু ব্যক্তিজীবনেই প্রকট হয়ে ওঠে না, সমাজেরও উৎপাদন ও সমৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং সমাজকে সেই অস্বাস্থ্যের দায় বইতে হয় অনাগত কালেও।

**শিশুস্বাস্থ্য ও জাতীয় সমৃদ্ধিঃ**

এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি শিশুস্বাস্থ্যের বিষয় আলোচনা করতে হয় তাহলে প্রথমেই বলতে হয়, কোন দেশের সমৃদ্ধির আসল মাপকাঠি সেই দেশের শিশুদের উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত স্বাস্থ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞদের মতে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের মধ্যেই দেশের উন্নতির প্রকৃত পরিচয় প্রতিফলিত। দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে যে শ্রম-শক্তি ও উৎপাদনশীলতা তার প্রতিশ্রুতি বহন করে স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুরা। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন, তাদের কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধির বিকাশের ওপর নির্ভর করে দেশের সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা। তাই

যে কোন দেশের উন্নয়ন ব্যয়ের একটা বড়ো অংশ দাবি করতে পারে শিশুস্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যকল্যাণের জন্য বিনিয়োগ।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার স্বাস্থ্য ভাবনায় পৃথিবী থেকে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় স্থির হয় বর্তমান শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সব দেশে শিশুমৃত্যুর হার হাজার প্রতি পঞ্চাশে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে এখন যেখানে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে কুড়িটি কি তারও কম শিশুর মৃত্যু হয় সেখানে দরিদ্র দেশগুলিতে, যাদের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ, শিশুমৃত্যুর হার গড়ে এখনও প্রতি হাজারে একশ জনের নীচে নয়। শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি, যার ফলে শিশুমৃত্যুর হার নামিয়ে আনা সম্ভব, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়েও বড়ো কথা, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবল মুষ্টীমেয় লোকের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির ফলেই মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের গড়হিসেব বেড়ে যেতে পারে কিন্তু শিশুমৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে নামিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন জাতির অধিকাংশের জীবনে স্বাস্থ্যকল্যাণের কার্যকর ভূমিকা।

**উন্নতিশীল দেশে শিশু স্বাস্থ্য ঃ**

যদিও দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্যকল্যাণের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবু বিশেষ করে কৃষিনির্ভর বা উন্নতিশীল দেশগুলির বেশীর ভাগের বেলায় এই উদ্যোগের সমূহ ফল যথেষ্ট আশাপ্রদ নয়। তার কারণ যেহেতু শিল্পোন্নত দেশগুলিই আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ এতকাল বজায় রেখে এসেছে তাই উন্নতিশীল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সেই নিয়ন্ত্রণের আওতায় স্বচ্ছন্দভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি এবং তার ফলে স্বাস্থ্য-কল্যাণে, বিশেষত শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে যথাযোগ্য বিনিয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। উন্নতিশীল দুনিয়ায় স্বাস্থ্যকর্মসূচী রূপায়ণে এটাই হল

আদি সমস্যা ; এছাড়া আছে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব। ১৯৩০ সালের বিশ্বজোড়া মন্দার পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৮০-র দশকে আবার অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। ফলে স্বভাবতই উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নতুন করে অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এগিয়ে এসেছে নতুন স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণে যাতে দেশে দেশে বিশেষত শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-সুবিধাগুলি স্বল্পব্যয়েই পাওয়া যেতে পারে। উন্নতিশীল বা পিছিয়ে থাকা দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যসমস্যা সংক্রান্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে তাদের কয়েকটি জরুরী প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই সুযোগ-সুবিধাগুলিকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে সেগুলি তারা সহজে সর্বত্র সমানভাবে পেতে পারে। সেগুলি ব্যয়সাপেক্ষ নয় অথচ বাস্তবক্ষেত্রে শিশুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে অপরিহার্য।

মৃত্যুহার হ্রাসের উদ্যোগ :

যে সব দেশ শিল্পে উন্নত ও সমৃদ্ধ সেই সব দেশে শিশুমৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমে যাওয়ার কারণ (১) সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে জীবনধারণের মানের উন্নয়ন, (২) সামাজিক অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে (৩) চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার। সামাজিক অগ্রগতিতে স্ত্রীশিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার ফলে মায়েদের মধ্যে শিশু-পালনে সচেতন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলিতেও শিশুদের মৃত্যুহার বিশেষভাবে কমতে শুরু করে কয়েকটি কারণে। সেগুলির মধ্যে (১) মহামারী দমন, (২) সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা, (৩) এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োগ, (৪) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ভূমিকা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকে এই সব উন্নতিশীল দেশে শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাসের গতি আর আগের মত নেই, বা বলা যেতে পারে, শিশুমৃত্যুর হার

আশানুরূপভাবে কমছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক বাজারের চাপের ফলে উন্নতিকামী দেশগুলির সামগ্রিক অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং শিশুস্বাস্থ্যের ওপরেও তার প্রভাব পড়েছে। অন্তত এই সমস্ত দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কোন উল্লেখযোগ্য ফল সাধারণ দরিদ্র শিশুদের কল্যাণে বিশেষ মেলে নি।

**ভারতের চিত্র ঃ**

আমাদের ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম উন্নতিশীল দেশ। এদেশে শিশুস্বাস্থ্যের চিত্রটা কি রকম একবার দেখা যাক। মোটামুটি হিসেবে বলা যায়, এদেশে প্রতি বছর ২ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুর জন্ম হচ্ছে যাদের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ শিশুস্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে যথার্থ স্বাস্থ্যবান। বাকি ২ কোটি শিশুর অবস্থাটি কি? এদের প্রতি হাজার জনের মধ্যে ১২০ জনের আয়ু এক বছরের বেশী নয়। প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়। প্রতি দশ জনে ছ'জন অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টি আর রোগে ভুগে যারা বেঁচে থাকে তারা দেহে ও মনে সুস্থ স্বাভাবিক পরিণত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। এদেশে শিশুমৃত্যুর হার শিল্পোন্নত দেশ-গুলির তুলনায় অনেক বেশী। এক হাজার শিশুর জন্ম হলে তাদের মধ্যে অন্তত ১২৪টি শিশুই অকালে প্রাণ হারায়। ভারত এক বিশাল দেশ যেখানে এখনও গ্রাম-জনপদেরই প্রাধান্য। ফলে শহরের তুলনায় গ্রামে শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও বেশী। এই পার্থক্য, শহরের অপেক্ষা গ্রামে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। এর থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে, জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অভাবই এদেশে শিশুমৃত্যুর মূল কারণ। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের অনেক মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে ঠিকই কিন্তু এই সংগ্রামের পথ যেমন সহজ নয় তেমনি তার সাফল্যও সময়সাপেক্ষ।

বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশে জনগণের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা নানা সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল, সে কথাও ভুললে চলবে না। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দরকার শিশুদের মৃত্যুহার জরুরী ভিত্তিতে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যকর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ। সেটাই হবে আগামী শতাব্দীতে এক সম্ভাবনাময় বলিষ্ঠ জাতি গঠনের অঙ্গীকার।

**মৌলিক সমস্যা ঃ**

শিশুস্বাস্থ্যের কল্যাণে আবশ্যিক কর্মসূচীতে সেই সব ব্যবস্থার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যেগুলি উন্নতিশীল দেশের শিশুদের পক্ষে অপরিহার্য এবং যেগুলিতে আর্থিক ঝুঁকি তেমন নেই। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের নানা চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুস্বাস্থ্যের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে শিশুদের স্বাস্থ্যহানির প্রধান সমস্যাগুলি হল,—

১। কম ওজন বা অপরিণত বৃদ্ধি
২। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব
৩। পেটের অসুখ বা উদরাময়
৪। সংক্রামক রোগের আক্রমণ
৫। শ্বাসজনিত ব্যাধি
৬। জন্মগত অসঙ্গতি বা ত্রুটি

শিশুস্বাস্থ্যের এই সমস্যাগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে এদের একটির সঙ্গে অপরটির কার্যকারণ সম্পর্কও রয়েছে। শিশুর কম ওজন বা অপরিণত বৃদ্ধির কারণ প্রধানত অপুষ্টি। আবার অপুষ্টির ফলে শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধের শক্তি ঠিকমত গড়ে ওঠে না। রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক শক্তির অভাবে শিশু সংক্রামক রোগে সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার সংক্রামক রোগ থেকে দেখা দেয় পুষ্টিহীনতা। আসলে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশু-

স্বাস্থ্যের যে দুটি শত্রু একযোগে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশকে দারুণভাবে ব্যাহত করে তারা হল, অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগ। এই সব দেশে, বিশেষ করে পৃথিবীর দারিদ্র্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে শিশুরা বছরে গড়ে ১৬ দিন কোন-না-কোন অসুখে ভুগে থাকে। এ হিসেব রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকেই পাওয়া যায়। পেটের অসুখ, শ্বাসক্রিয়ার কষ্ট, হাম বা অন্য এক বা একাধিক সাধারণ সংক্রামক রোগ এদের শৈশবের কোন-না-কোন সময়ের সঙ্গী। এগুলির অত্যাচারে শিশুদের দেহের ওজন এত দ্রুত কমে যায় যে তা উদ্ধার করতে দীর্ঘ সময় লাগে। এক বছরে কেবল কয়েকবার পেটের অসুখে ভোগার ফলেই শিশুর বৃদ্ধির হার প্রায় অর্ধেক কমে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, তার বুদ্ধির বিকাশ, তার মানসিক গঠনের ক্রম-পরিণতির প্রতিটি পর্বে যে নির্দিষ্ট সময়ের দরকার তা যদি রোগ ভোগে বারবার ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে শিশুর পক্ষে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তার আশা থাকে না। সে এক চরম পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়।

**সমাধানের উপায়ঃ**

অপুষ্টি আর সংক্রামক রোগ মিলে যে দুষ্টচক্রের সৃষ্টি করে তা ভেদ করার জন্য আধুনিক কালে দেশে-বিদেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এটা বোঝা গেছে যে, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্য চেতনার উন্মেষ, উৎপাদনবৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও ব্যাপক বণ্টনের সুযোগ জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে অপরিহার্য পদক্ষেপ, যা সামাজিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এছাড়া পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পরিস্রুত পানীয় জলের যোগান অব্যাহত রাখাও ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দরিদ্র দেশগুলির অধিবাসীদের বাঁচার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এই সব ব্যবস্থার গুরুত্ব যেমন

আছে তেমনি এদের আকার ও আয়তনও বেশ বড়ো মাপের। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী বলে প্রয়োগগত জটিলতাও অসম্ভব নয়। অপরদিকে বিশেষ করে শিশুস্বাস্থ্যের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যাভিজ্ঞ মহল কয়েকটি জরুরী ও মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়ে একমত হয়েছেন। ইংরাজী ভাষার কয়েকটি শব্দের আদ্যক্ষর জুড়ে এর একটি সাংকেতিক নামও দেওয়া হয়েছে—GOBIN। 'গোবিন' কথাটির অর্থ হল, Growth বা শিশুর বৃদ্ধি, Oral rehydration বা শিশুর শরীর থেকে নির্গত জলের পুনঃপূরণ, Breast-feeding বা মাতৃদুগ্ধদান, Immunization বা রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা ও Nutrition বা পুষ্টি। এই পাঁচটি জরুরী প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে দেশে দেশে শিশু-স্বাস্থ্যের বলিষ্ঠ বনিয়াদ।

## ॥ মা ও শিশু ॥

### মাতৃত্বের সূচনা ঃ

নাড়ীর যোগ বা নাড়ীর সম্পর্ক বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যে নিবিড় ও নিকট সম্পর্কের কথা বুঝে থাকি তা বোধ হয় মা ও শিশুর মধ্যে আবহমান কালের অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভাবনা থেকেই এসেছে। আসলে মায়ের সঙ্গে শিশুর জন্মসূত্রে আক্ষরিক অর্থে নাড়ীর যোগ। কথাটা তাই একদিক থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। মা ও শিশু যেন একের মধ্যে দুই। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। সন্তান ভ্রূণঅবস্থা থেকেই মাতৃগর্ভে একটু একটু ক'রে মায়ের শরীর থেকে পুষ্টিরস সংগ্রহ ক'রে বেড়ে ওঠে। তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার যথার্থ বৃদ্ধি ও বিকাশের শুরু মাতৃগর্ভে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে একাক্ষর শব্দের সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে সে 'মা'। কিন্তু সঠিক অর্থে মাতৃত্বের সূচনা তারও আগে—গর্ভকালে।

আবার মায়ের গর্ভকালেরও আগে তার মনের মধ্যে সুপ্ত থাকে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। কবিবর্ণিত শিশুমনের আপন সৃষ্টিরহস্যের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে মা তাই সরল ও আন্তরিকভাবে বলতে পারেন,—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'।

মায়ের এই 'ইচ্ছা' বা সন্তান কামনার সঙ্গে পরবর্তীকালে গর্ভধারণ ও সুপ্রসবের সম্ভাবনার বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত সম্পর্কের বিষয়ে আধুনিক প্রজননবিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই শিশুজন্মেরও আগে মাতৃত্বের 'প্রস্তুতি' ও 'পরিকল্পনা' আধুনিক প্রজননবিজ্ঞানে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁরা মনে করেন, শিশুর জন্মদান কেবল একটি প্রাকৃতিক ঘটনাই নয়, একটি পরিণত ও সুস্থিত মানসিকতারই ফল। একটি শিশুর জন্ম যে কোন দেশের পরিবারিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃ-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সার্থক পরিণতি।

শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রেই মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিশুর ওজন বৃদ্ধি শিশুস্বাস্থ্যের গোড়ার কথা। গর্ভসঞ্চারের পর মায়ের শরীরের সঞ্চিত খাদ্য থেকে আহার সংগ্রহ করেই ভ্রূণরূপী সন্তান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাস প্রতিমাসে তার ওজন যে হারে বাড়ে পরের ছয় মাস তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হারে বাড়তে থাকে। এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তখনই যখন মায়ের শরীরে অতিরিক্ত খাদ্যের যোগানে টান পড়ে। তাই এই সময়ে অর্থাৎ গর্ভকালে মায়ের শরীরের যত্ন এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন।

গর্ভকালে মায়ের শারীরিক প্রক্রিয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন নানা কারণেই ঘটতে পারে। যে সব গ্রন্থি থেকে 'হরমোন' নিঃসৃত হয় সেগুলির কিছু তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। রক্তের সরবরাহ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে হৃদ-যন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া মায়ের শরীরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরভোজী মানবসন্তানের ক্রমবর্ধমান অস্তিত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার

ব্যাপারে বিভিন্ন মায়ের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই এই বিশেষ সময়ে মায়ের শারীরিক পরিচর্যার প্রতি সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলেও গর্ভাবস্থা মাতৃত্বের সম্ভাবনায় শারীরিক প্রক্রিয়ার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা থেকে মুক্তিই মাতৃত্বের প্রথম প্রতিশ্রুতি। মায়ের মানসিক প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসই তার আত্মজ-র সুপ্রসবের পথ প্রশস্ত করে। তাই যতদূর সম্ভব নিরুদ্বিগ্ন ও নিঃশঙ্ক মনে এই শারীরিক পরিবর্তনকে মায়েদের সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত। দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় শারীরিক পরিবর্তন ও মানসিক চাপের প্রভাবে বিপন্ন মায়েরা উচ্চ-রক্তচাপ ও নানা ধরনের ব্যাধিতে বেশী আক্রান্ত হয়। Toxæmia বা রক্তবিষণ, হাত-পা ফুলে যাওয়া, খিঁচুনিধরা ইত্যাদি উপসর্গ হতে দেখা যায়। এর ফলে গর্ভস্থ শিশুর মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

**মায়ের রক্তাল্পতা ঃ**

এই সময়ে মায়ের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার। আমাদের দেশে মায়েদের অনেকেই রক্তাল্পতায় ভোগেন। এ দেশে মায়েদের রক্তাল্পতা এত ব্যাপক যে, শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন মায়েরই গর্ভ-কালের শেষের তিন মাস রক্তের অপরিহার্য উপাদান লোহিতকণিকার পরিমাণ অত্যন্ত কমে যায়। এই লোহিতকণিকার পরিমাণ কমে যাওয়াই রক্তাল্পতার কারণ। রক্তাল্পতা থেকে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। গর্ভকালের শেষ তিন মাস মায়ের শরীরে রক্তের লোহিতকণিকাশ্রিত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেকক্ষেত্রে শতকরা ১০ গ্রামেরও নীচে নেমে যাওয়ায় মা ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যহানি, এমন কি জীবনের আশঙ্কাও ঘটে থাকে। আমাদের দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার অকালমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণই হল মায়ের নিদারুণ রক্তাল্পতা। মায়ের রক্তাল্পতার ফলে নবজাত শিশুর ওজনও স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের

সাহায্যে দেহকোষে অক্সিজেন সঞ্চালিত করে। রক্তাল্পতার ফলে শরীরে অক্সিজেনের স্বাভাবিক সঞ্চালন ব্যাহত হয় বলে মায়ের শারীরিক দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। তাতে সুস্থ স্বাভাবিক সন্তানজন্মের সম্ভাবনা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। সাধারণত মায়েদের খাদ্যে লৌহ জাতীয় (iron) পুষ্টি-উপাদানের অভাবের জন্যেই গর্ভকালীন রক্তাল্পতা বেশী হতে দেখা যায়। এছাড়া liver বা যকৃতের গোলমাল বা জটিলতা থেকেও রক্তাল্পতা ঘটতে পারে। তাই এই সময়ে মায়ের দৈনিক খাদ্য সঠিক হওয়া চাই।

গর্ভাবস্থায় মায়ের খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার ওপর গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি ও বিকাশ যথেষ্ট নির্ভর করে। 'ঠিকমত' বলতে একদিকে বোঝায় (১) বিভিন্ন খাদ্যের যোগে শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির সুষ্ঠু, সামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে (২) মায়ের নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাদ্যের সংস্থান। মায়ের শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান ঠিক রাখতে যেমন বিভিন্ন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যের সুষম ব্যবস্থা করতে হবে তেমনি মা ও সন্তান, একই সঙ্গে যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টি পেতে পারে তার জন্য মায়ের খাদ্যের পরিমাণও বাড়াতে হবে।

**মায়ের খাদ্য ঃ**

শিশুকল্যাণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় যে সব তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশে যে সব শিশুর জন্মকালীন ওজন কম থাকে তারা সাধারণত মাতৃগর্ভে অবস্থানের স্বাভাবিক সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই জন্ম নেয়; কিন্তু উন্নতিশীল দেশে অনেক শিশু স্বাভাবিক সময়ে ভূমিষ্ঠ হলেও তারা কম ওজনের হয়ে থাকে প্রধানত মাতৃগর্ভে তাদের অপুষ্টির জন্য। এর কারণ মায়েরা নিজেরাই গর্ভকালে অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। এই সব শিশুর জন্মকালীন ওজন ২½ কেজিরও কম হয় এবং এদের অনেকেরই আয়ু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ঝরে যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে

বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, গর্ভকালের শেষ তিন মাস মায়েদের জন্য উপযুক্ত পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করায় শিশুদের জন্মকালীন ওজন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে এরকম এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, গর্ভকালের শেষ তিন মাস দৈনিক ৫০০ ক্যালরি ও ১০ গ্রাম প্রোটিন মায়েদের খাদ্যে নিয়মিত যোগান দিয়ে তাদের শিশুদের জন্ম-ওজন গড়ে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, গর্ভবতী মায়েদের জন্য পরিপূরক খাদ্য, লৌহঘটিত উপাদান ও ফলিক অ্যাসিড নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমাদের দেশে সাধারণত মায়েদের রক্তাল্পতার কারণ খাদ্যে লৌহঘঠিত উপাদানের অভাব। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব উন্নতিশীল দেশেই মা ও তার শিশুর অপুষ্টির এটাই প্রধান সমস্যা। আর্থিক কারণে এবং খাদ্যগুণ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মায়েদের সঠিক খাদ্য নির্বাচন হয় না। অপুষ্ট শিশুর জন্মকালীন ওজন কম হওয়ার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত যথাসময়ের আগেই শিশুর জন্ম (premature birth) এবং দ্বিতীয়ত মায়ের অপুষ্টি। আমাদের দেশে এই দ্বিতীয় কারণটি অর্থাৎ মায়ের অপুষ্টিই অধিকাংশ নবজাতকের কম ওজন বা হীনস্বাস্থ্যের মূল কারণ। এদেশে শিশুদের স্বাভাবিক জন্ম-ওজন ৩ থেকে ৪ কেজির মধ্যে হয়ে থাকে। ৩ কেজি বা ২½ কেজির কম হলে শিশুরা হয় অপুষ্ট আর তার জন্য মায়েদের পুষ্টিহীনতাই বিশেষ ভাবে দায়ী।

**খাদ্যগুণ ও খাদ্যনির্বাচন ঃ**

আলোচনা প্রসঙ্গে এখন এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, মায়েরা সাধারণ অবস্থায় পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যা খেয়ে থাকে গর্ভাবস্থায় তার চেয়ে বেশী খাদ্য তাদের দরকার। প্রশ্ন হতে পারে, কতটা বেশী? বিশেষজ্ঞদের মতে শতকরা দশ ভাগ বেশী। কিন্তু এই দশ শতাংশ বেশী কি শুধু পরিমাণে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন,

এই বৃদ্ধি আসলে খাদ্যের গুণগত উপাদান ও ক্যালরির হিসাবে পরিমেয়। স্পষ্টতই তাঁরা খাদ্যের উপাদান ও ক্যালরি,—এই দুটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রথমে ক্যালরির কথায় আসা যাক। কোনো এঞ্জিনকে চালনা করার জন্য যেমন জ্বালানির দরকার তেমনি আমাদের দেহযন্ত্রকে সচল রাখতে প্রয়োজন তাপশক্তির। এই তাপশক্তির পরিমাণের একককে বলে ক্যালরি। প্রতিনিয়তই আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করতে যে তাপশক্তির ক্ষয় হচ্ছে তার পরিমাপ আমরা ক্যালরির সাহায্যেই করে থাকি। একটা সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে একজন স্বাভাবিক উচ্চতার প্রাপ্তবয়স্ক মাঝারি পরিশ্রমী মানুষ তাঁর প্রতি কেজি দৈহিক ওজন পিছু দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ ক্যালরির মত ব্যয় করে থাকেন। কারুর ওজন যদি ৫০ কেজি হয় এবং তিনি যদি খুব বেশী কায়িক পরিশ্রম না করেন তাহলে তাঁর দৈনিক কাজকর্ম নির্বাহ করতে শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য অন্তত ১৫০০ ক্যালরির প্রয়োজন। একজন গর্ভবতী মায়ের পক্ষে এই ক্যালরির প্রয়োজন আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক; অন্তত আলোচ্য হিসেব অনুযায়ী গর্ভকালের শেষ তিন মাস এবং সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার সময় দৈনিক ২০০০ ক্যালরির মত। অবশ্য এই হিসেব প্রতিটি মায়ের নিজস্ব শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত বিভিন্নতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিরীক্ষা ও সুপারিশের ওপরেই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে। যে কথাটি এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হল, গর্ভবতী মায়ের শারীরিক বিপাকের জন্য যতটা ক্যালরির প্রয়োজন তা পর্যাপ্ত না হলে মায়ের শরীরে অপুষ্টির লক্ষণ দেখা দেবে এবং তার প্রতিক্রিয়া গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধিকেও ব্যাহত করবে। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ভারতীয় জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান বা National Institute of Nutrition-এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদেশে গর্ভবতী মায়েরা গড়ে দৈনিক ১৪০০ ক্যালরি তাদের খাদ্য থেকে সংগ্রহ করতে পারে যা তাদের মোট চাহিদার অর্ধেকের কিছু বেশী। অপরপক্ষে একজন

সুস্থ স্বাভাবিক গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের দৈনিক মোট চাহিদা প্রায় ২৫০০ ক্যালরি।

এই ক্যালরি পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য খেয়ে থাকি তার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে চিন্তাচর্চার শুরু খুব বেশী দিন আগে নয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। খাদ্যের এই পুষ্টি-গুণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ায়, এমন কি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন বয়স ও অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের খাদ্য নির্বাচনের প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরাট আয়োজন চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় এশিয়া-আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশগুলি তাদের বিপুল জনসমষ্টির দীর্ঘকালীন অপুষ্টির সমস্যা দূর করার জন্য খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সেই গুণানুসারে খাদ্যের সঠিক নির্বাচনের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। খাদ্যের উৎকর্ষতা কি করে বাড়বে এবং বিভিন্ন খাদ্য থেকে চূড়ান্ত পুষ্টিমূল্য optimun value ) লাভ করার জন্যে বিভিন্ন খাদ্যের সুষ্ঠু, সমাহার কিভাবে সম্ভব, সে-বিষয়ে প্রয়োগগত কলাকৌশল ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক স্তরে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টনের চেষ্টাও চলেছে। এগুলি একযোগে সক্রিয় ভূমিকা নিলে তবেই দেশের বুক থেকে অপুষ্টির দুঃসহ গ্লানি দূর করা সম্ভব।

**লৌহ উপাদান ঃ**

শিশুকে যাতে জন্মকাল থেকেই অপুষ্টির দুর্ভোগ সইতে না হয় তার জন্যে মায়ের খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদানগুলি গোড়া থেকে থাকা চাই। আমরা আগেই আলোচনা করেছি মায়ের রক্তাল্পতার কথা। বিশেষত আমাদের দেশে সাধারণ নিম্নবিত্ত সমাজের মায়েদের অধিকাংশের রক্তাল্পতার প্রধান কারণই হল তাদের খাদ্যে লৌহ (iron)-এর অভাব। রক্তসৃষ্টির সহায়ক এই বিশেষ উপাদানটি কোন্

কোন্ খাদ্যে এবং কি রকম মাত্রায় আছে তার ওপর নির্ভর করছে মায়েদের খাদ্য নির্বাচনের একটা বড়ো দিক। যে সব খাদ্যে এই লৌহ উপাদান বেশী মাত্রায় আছে এবং যেগুলি সুলভে পাওয়া যায় সেগুলিই নির্বাচনের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু লৌহসমৃদ্ধ সুলভ খাদ্যের ব্যবস্থা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়; কারণ সেই খাদ্যের তালিকা থেকে বেছে নিতে হবে এমন কিছু খাদ্য যা মায়ের শরীরে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। কাজেই মায়ের শারীরিক অবস্থা বিশেষে সহজপাচ্যতার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। পুষ্টী-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু কিছু খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন যেমন 'বি-কমপ্লেক্স' এবং খনিজ লবণের সহযোগে শরীরে রক্ত সৃষ্টীর সহায়ক লৌহ উপাদানের কার্য-কারিতা সহজতর হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে রক্তাল্পতা প্রতিরোধে মায়ের এমন খাদ্য নির্বাচন করতে হবে যেটি লৌহ উপাদানে সমৃদ্ধ, সুলভে মেলে, যার সহজপাচ্যতা প্রমাণিত এবং যার সঙ্গে কিছু কিছু খাদ্যপ্রাণ ( vitamins ) ও খনিজ লবণের সহযোগ থাকা চাই। সাধারণত যে সব খাদ্য লৌহ-উপাদানে সমৃদ্ধ অর্থাৎ যেগুলিতে লৌহ-উপাদান বেশী মাত্রায় আছে এবং যেগুলি সহজলভ্য সেগুলির মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সবুজ শাকসব্জির কথা। কারণ যে সমস্ত খনিজ লবণ মাটির তলায় সঞ্চিত থাকে তাদের মধ্যে লৌহমিশ্রিত খনিজ লবণ অন্যতম। উদ্ভিদ মাটি থেকে এই লৌহমিশ্রিত লবণ শোষণ করে বেড়ে ওঠে। এই লৌহের অভাবেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ক্লোরোফিল গঠনের কাজও ঠিকমত হয় না। তার ফলে গাছ যেমন বাড়তে পারে না তেমনি তার পাতার রঙও বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই সবুজ ও পুষ্ট শাকসব্জি থেকে মানুষ তার রক্তগঠনের জন্য অপরিহার্য লৌহ-উপাদান সহজে সংগ্রহ করতে পারে। বিভিন্ন শাকসব্জির মধ্যে আবার এই লৌহ-উপাদানের তারতম্য আছে। সাধারণত শীতের সব্জি, থোড়, মোচা, কালোকচুর পাতা, নটে শাক, ধনে শাক, মেথি শাক, পুদিনা পাতা, ডুমুর, ঢেঁড়স ইত্যাদি শাকসব্জিতে লৌহ উপাদান কমবেশী পরিমাণমত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আমাদের দেশে

বহুদিন ধরে বর্ষিয়সী মহিলাদের মধ্যে এরকম একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, আসন্নপ্রসবা তার নিয়মিত আহারের সঙ্গে কিছু করে শাকপাতা খেলে তার ভাবী সন্তানের মাথা কেশশোভিত হবে। এই লৌকিক বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি না থাকলেও এর আড়ালে শাকপাতা খাওয়ার পক্ষে যে সংস্কারগত সমর্থন মেলে তা কিন্তু পুষ্টিমূল্যের বিচারে উপেক্ষণীয় নয়।

দানাশস্য জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ডালশস্য, সয়াবীন, গম, ঢেঁকিছাঁটা চাল, বাজরা ইত্যাদি লৌহ-উপাদানের উৎস।

এছাড়া প্রাণীজ খাদ্যের মধ্যে মেটে বা 'লিভার', এবং তুলনামূলক-ভাবে কম হলেও মাংস, ডিম ও মাছেও লৌহ-উপাদান পাওয়া যায়। যদিও এই সব খাদ্যের কিছু কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা আর্থিক কারণে সম্ভব না হতেও পারে তবু এগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে যথাসম্ভব পুষ্টীর ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার।

**প্রোটিন ঃ**

লৌহ-উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য ছাড়া মায়ের গর্ভকালীন পুষ্টির জন্য তার খাদ্যে প্রোটিন উপাদানের গুরুত্ব অপরিহার্য। এটির প্রয়োজন, প্রথমত মায়ের সুপ্রসব ও প্রসবোত্তর কালে সন্তানকে বুকের দুধ যোগানোর জন্য এবং দ্বিতীয়ত শিশুর উপযুক্ত গঠন ও বৃদ্ধির জন্য। প্রোটিন যেমন একদিকে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে সাহায্য করে তেমনি আর এক-দিকে স্নায়ু ও মাংসপেশীকে সবল ও সুদৃঢ় করে। তাছাড়া প্রোটিন থেকে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয় বলে আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ব্যয় করা অনেক সহজ হয়। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় ক্যালরির মোট চাহিদার প্রায় ১০—১৫ শতাংশ প্রোটিন খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। শরীরে কিছু কিছু জারক রস নিঃসরণে এবং রোগ প্রতিরোধে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং গর্ভবতী মায়েদের অতিরিক্ত ক্যালরির যোগান, শারীরিক ক্ষয়-

ক্ষতির পুরণ, গর্ভস্থ সন্তানের গঠন ও বৃদ্ধি, রোগ-প্রতিরোধ ও খাদ্য পরিপাকের উদ্দেশ্যে জারকরস নিঃসরণ ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রোটিনের গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে পুষ্টিবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলে এই বিশেষ খাদ্য-উপাদানের পুষ্টিকারিতার সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

প্রোটিন পাওয়া যায় প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ, এই দু'ধরনের খাদ্য থেকে। প্রাণীজ খাদ্যের মধ্যে আছে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা দই। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে সবরকম ডাল শস্য, যেমন মুসুর, মুগ, ছোলা, মটর, কলাই, অড়হর ইত্যাদি এবং বিশেষ করে সয়াবীনে যথেষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। চাল, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি দানাশস্যে কম করে হলেও প্রোটিন আছে।

অন্যান্য উপাদান :

লৌহ ও প্রোটিন জাতীয় পুষ্টি-উপাদান ছাড়াও মায়ের খাদ্যে একটু ধাতব লবণ, যেমন ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এবং কিছু খাদ্যপ্রাণ ( vitamin ), যেমন vit-A, vit-B ও vit-C বিশেষভাবে থাকা চাই। এছাড়া স্নেহ ( fat ) ও শর্করা ( carbohydrate ) জাতীয় খাদ্যও মায়ের দরকার ; কেন না, ঐ দুটি উপাদান মাকে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরীর প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

সাধারণত মায়ের দৈনিক ২১০০ ক্যালরীর প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যে কোন্ কোন্ বিশেষ উপাদান কী পরিমাণ থাকা দরকার তার একটা চলতি হিসেব হল :

প্রোটিন........৮০ গ্রাম

স্নেহ বা চর্বি জাতীয়........৬০—৬৫ গ্রাম

শর্করা........৩০০—৩২০ গ্রাম

লৌহজাতীয়........২০—৩০ মিলিগ্রাম

ক্যালসিয়াম........১·৫ গ্রাম

ফসফরাস........১·৭৫ গ্রাম

ভিটামিন-এ........৩০০০....৪০০০ 1. U.

ভিটামিন-বি১........১—২ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-সি.........১০০ মিলিগ্রাম
রিবোফ্লেভিন........২ মিলিগ্রাম
নিকোটিনিক এসিড........১৫ মিলিগ্রাম ইত্যাদি।

আবশ্যিক খাদ্য ঃ

এই হিসেবে মায়েদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় যেগুলি পর্যাপ্ত পুষ্টির জন্য আবশ্যিক সেগুলি হল —

দুধ........½ লিটার
( দুধের তৈরী ছানা, দই ইতাদি )
মাছ বা মাংস........১২৫ গ্রাম
ডিম........১টি বা ২টি
শাকসব্জি........২৫০ গ্রাম
ফল ( মরশুমী )........১টি

এছাড়া পরিমাণমত ভাত, রুটি, ডাল, ঘি বা মাখন, চিনি ও নুন। যারা মাছ মাংস খাবে না তাদের ডাল শুঁটিজাতীয় খাদ্য যাতে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পরিমাণ বেশী আছে, যেমন সয়াবীন বিকল্প খাদ্য হিসেবে কিছু বেশী খেতে হবে।

মায়েদের খাবারের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, অতিরিক্ত ঘি-তেল-মশলা দেওয়া খাবার বর্জন করতে হবে। এই জাতীয় খাবারের খাদ্যগুণ অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায় এবং খাবার গুরুপাক হওয়ার ফলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

দ্বিতীয়ত, খাবার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে। বাজারের কেনা খাবার বা বাসি খাবার খাওয়া উচিত হবে না। গর্ভকালে মায়েদের মুখরোচক খাবারের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাজারের তৈরী খাবার মুখরোচক হলেও অনেক সময় রোগজীবাণু বা বীজাণু সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত মায়েদের খুব বেশী জল খাওয়া দরকার। দিনে অন্তত

৮/১০ গ্লাস জল খেতে হবে। জল অবশ্যই পরিশ্রুত হওয়া চাই। জল খাওয়ার কয়েকটি প্রধান উপকারিতা হল,—

১। রক্তকে প্রবহমান রাখে

২। খাবার পরিপাকে সাহায্য করে

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

৪। শরীরের অভ্যন্তর পরিশ্রুত করে।

**মায়েদের যত্ন ও পরিচর্যা ঃ**

বলিষ্ঠ শিশুর জন্ম-সম্ভাবনা শুধু মায়েদের পুষ্টিকর আহারের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। মায়েদের স্বাস্থ্যের আরও কিছু দিক আছে যেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্যের অনেকখানিই অপচিত হয়ে যায় যদি মায়েদের পেটে কৃমি থাকে অথবা পাকস্থলীতে কোন আন্ত্রিক সংক্রমণ ঘটে। এরকম অবস্থা যাতে না হয় তার জন্য আগে থেকে সাবধান হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পায়খানা যাতে পরিষ্কার হয় তা দেখতে হবে।

দাঁতের যত্ন নিতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা করাতে হবে। ডায়াবিটিস্ থাকলে তারও চিকিৎসা করাতে হবে। বংশানুক্রমে এই রোগ শিশুতেও সংক্রামিত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ বা অন্য কোন ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে কোন উত্তেজক ওষুধ বা মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন নেশার অভ্যাস করা উচিত নয়। এর ফলে শিশুর স্বাস্থ্যের ভীষণ অনিষ্ট হতে পারে। মৃত শিশু প্রসব হতে পারে অথবা নবজাতকের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পেতে পারে।

নিয়মিত স্নান করা, শরীরকে স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখা এবং মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখা উচিত।

ক্লান্তিকর পরিশ্রম ও নিঃসঙ্গতা এড়িয়ে চলা এবং গর্ভকালের শেষ আট সপ্তাহ সহবাস না করাই বাঞ্ছনীয়।

গর্ভাবস্থায় মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার। তাছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব যে মায়েদের শরীরের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার সে বিষয়ে তাদের পরিষ্কার ধারণা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা দরকার।

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিকগুলির মাতৃমঙ্গল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ইনজেকসন নিয়মিত নিতে হবে। ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের জন্য টিটেনাস্ ভ্যাকসিন, রক্তাল্পতা রোধের জন্য লৌহঘটিত ওষুধ বা iron বড়ি এবং শিশুর দৃষ্টি সতেজ রাখা বা রাত্রান্ধতা প্রতিকারের জন্য vit A এই সব মাতৃমঙ্গল বিভাগ বা 'ওয়েলবেবী' ক্লিনিক থেকে খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। এই সব বিধিব্যবস্থা সময়মত গ্রহণ করলে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত গোড়া থেকে চললে মায়ের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না।

## ॥ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ॥

**পটভূমি ঃ**

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্ন সঞ্চিত সম্পদরাশির মধ্যে মঙ্গলকাব্য অন্যতম। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' কথাটি ব্যাপক অর্থে গার্হস্থ্য জীবনের মঙ্গলকামনার সূচক। দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজের গার্হস্থ্যচিত্রের বর্ণনায় এই মঙ্গলকাব্যের এক বর্ণোজ্জ্বল চরিত্র কালকেতুর পরিচয় অনেকের কাছেই অজানা নয়। কালকেতুর বলিষ্ঠ ও কর্মঠ পৌরুষে পদার্পণের আগে তার শৈশব কৈশোরের দিনগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, "দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।" কবির এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে সত্য। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিল তিল করে বেড়ে ওঠে। মাতৃক্রোড় থেকে সে ধীরে ধীরে নেমে আসে মাটির কোলে। মমতামাখা মাতৃস্পর্শে তার কোমল অনুভূতিগুলি সজাগ হতে শুরু করে। তুহাত

দিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ ক'রে সে অনুভব করে স্বাবলম্বনের প্রথম রোমাঞ্চ। সেই তার প্রথম অনুভবের দিনগুলির স্বাদ কবি-কল্পনায় কমনীয় মাধুর্যে কাম্য হয়ে ওঠে, "দু হাত দিয়ে বিশ্বরে ছুঁই শিশুর মত হেসে।"

শিশুর এই যে কোমল কোরক থেকে পর্ণে পর্ণে বর্ণে বর্ণে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা, এরই নাম শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ। নবজাতকের শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণের মধ্যে তার শরীর ও মনের যে ক্রমিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষিত হয় তাকেই তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির প্রকাশ বলা যেতে পারে। জন্মের পর থেকে দিনে দিনে একটু একটু করে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দেহে ও মনে কিছু কিছু পরিবর্তন হয় যা থেকে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির একটা পরিমাপ করা যেতে পারে।

**শিশুর ওজন ঃ**

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির পরিমাপের প্রথম মাপকাঠি হল তার দেহের ওজন। আমাদের দেশে একটি সুস্থ স্বাভাবিক নবজাতকের ( full term baby ) ওজন হওয়া উচিত কমপক্ষে ৩ কেজি। ২½ কেজির কম ওজনের নবজাতককে এই মাপকাঠিতে পূর্ণ বা স্বাভাবিক ওজনের শিশু বলা যায় না। মনে রাখতে হবে, জন্মের দু-একদিন পর থেকে শিশুর জন্ম-ওজন স্বাভাবিকভাবেই কমতে থাকে। মায়েদের বিশ্বাস, এই সময়ে শিশুর শরীরে জল শুকোয়। কিন্তু ১০-১২ দিনের মধ্যেই শিশুর ওজন বেড়ে আবার জন্ম-ওজনের সমান হওয়া উচিত। প্রথম এক বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে। প্রথম তিন মাস সে প্রতিদিনে ২৫—৩০ গ্রাম বাড়ে। তারপর থেকে এই বৃদ্ধির হার কিছু কমে যায়। শিশুর ওজন বৃদ্ধির একটা প্রচলিত সূত্র আছে। সেই সূত্র অনুযায়ী শিশুর ৫—৬ মাস বয়সে তার ওজন জন্ম-ওজনের দ্বিগুণ হয় এবং ১ বছর বয়সে জন্ম-ওজনের তিন গুণ হয়। শিশুর ২ বছর বয়সে তার ওজন হয় জন্ম-ওজনের চারগুণ।

শিশুর জন্ম-ওজন যদি হয় ৩ কেজি তাহলে হিসাবমত তার



16645

৫/৬ মাস বয়সে ওজন হওয়া উচিত প্রায় ৬ কেজি ( ৩ × ২)
১ বছর ,, ,, ,, ,, ,, ৯ কেজি ( ৩ × ৩)
২ বছর ,, ,, ,, ,, ,, ১২ কেজি (৩ × ৪)
৩ বছর ,, ,, ,, ,, ,, ১৪ কেজি / ১৫ কেজি
৪ বছর ,, ,, ,, ,, ,, ১৮ কেজি।

এই প্রচলিত সূত্র যে সর্বত্র সব শিশুর বেলায় সমানভাবে খাটবে তা বলা যায় না। যে সব শিশুর জন্ম-ওজন কম তাদের ৩-৪ মাস বয়সেই ওজন দ্বিগুণ হতে দেখা গেছে, এমন কি এক বছর বয়সেই তাদের ওজন হয়েছে জন্ম-ওজনের চারগুণ। অপরপক্ষে ২ বছর বয়সের পর থেকে ওজন বৃদ্ধির হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও কম হতে পারে।

সাধারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, জন্মের পর থেকে প্রথম ৩/৪ বছরের মধ্যে শিশুর ওজন প্রতি বছর গড়ে ২ কেজি ৫০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ৭৫০ গ্রাম মত বাড়লে তাকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিমাপ ধরা যেতে পারে।

বয়স অনুপাতে শিশুর ওজন স্বাভাবিক আছে কিনা তা জানবার আরও একটি সহজ সূত্র আছে। (ক) শিশুর ৩ মাস বয়স থেকে ১২ মাস বা ১ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক ওজনের হিসেব =

$$\frac{\text{শিশুর যত মাস বয়স} + ৯}{২} \text{ কেজি}$$

শিশুর বয়স যদি ৯ মাস হয় তাহলে তার স্বাভাবিক ওজন হওয়া উচিত

$$\frac{৯ + ৯}{২} = ৯ \text{ কেজি}$$

(খ) এরপর ১ বছর থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ন্ত শিশুর স্বাভাবিক ওজনের হিসেব =

শিশুর যত বছর বয়স × ২ + ৮ কেজি।

এই হিসেব অনুযায়ী একটি ছ'বছরের শিশুর স্বাভাবিক ওজন =

৬ × ২ + ৮ = ২০ কেজি।

**শিশুর দৈর্ঘ্য ঃ**

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্যতম পরিমাপক হল শিশুর দৈর্ঘ্য। একটি নবজাতকের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের পরিমাপ হওয়া উচিত ২০" (৫০·৮ সেমি) মত। ১ বছর বয়সে এই দৈর্ঘ্য বেড়ে দেড়গুণ হওয়ার কথা অর্থাৎ ৩০" (৭৬·২ সেমি) মত।

২ বছর বয়স থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাপের সহজ সূত্র হল—

যত বছর বয়স তার ২½ গুণ + ৩০" (৭৬·২ সেমি)

এই হিসেব অনুযায়ী একটি ৪ বছর বয়সের শিশুর উচ্চতা (৪ × ২½ + ৩০) ইঞ্চি বা ৪০ ইঞ্চি (১০১·৬ সেমি) হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪ বছর বয়সের পর থেকে গড়ে অন্তত ২" ইঞ্চি (৫·০৮ সেমি) করে প্রতি বছর লম্বা হওয়া উচিত প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত। শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার স্বভাবতই কমে আসে।

এখন প্রশ্ন হল, শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাপ নিয়মিত করা হয় কিনা। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না; অথচ এই পরিমাপ করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শিশুর ওজন ও উচ্চতার পরিচায়ক একটি chart বা তথ্যতালিকা রাখার সুফল সম্পর্কে বাবা-মাকে বিশেষ সচেতন হতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অবহিত করার অনেকখানি দায়িত্ব রয়েছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণকর্মীদের। এই পরিমাপ থেকেই শিশুস্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। অন্যথায় সময়োপযোগী ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

**অন্যান্য পরিবর্তন ঃ**

ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শরীরে অন্যান্য কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করবার মত।

প্রথমত, মাথার মাঝখানের নরম অংশের পরিবর্তন। নবজাতকের

মাথার মাঝখানে যে নরম অংশটি থাকে সেটির আকার জন্মের পর যতটা বড় থাকে, প্রথম ৬ মাসের মধ্যে তা সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ৯ মাস থেকে ১৮ মাস বা দেড় বছর বয়সের মধ্যে তা বেশ শক্ত ও দৃঢ় হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, মাথার পরিধির পরিমাপের বৃদ্ধি। জন্মকালে একটি সুস্থ সবল শিশুর মাথার স্বাভাবিক পরিমাপ থেকে বোঝা যায় মাতৃগর্ভে শিশুর পুষ্টি ও পরিণতি যথাযথ হয়েছে কিনা।

জন্মকালে পরিণত শিশুর মাথার পরিধি হয় ১২″-১৩″ (৩০·৫-৩৩) সেমি
৬ মাস বয়সে তা বেড়ে হওয়া উচিত প্রায় ১৬″-১৮″ (৪০·৬-৪৫·৭) সেমি
১ বছর বয়সে ,, ,, ,, ,, ,, ১৭″-১৯″ (৪৩·২-৪৮·৩) সেমি

এই পরিমাপের সঙ্গে শিশুর মানসিক বা বৌদ্ধিক বিকাশের একটা সম্পর্ক আছে।

তৃতীয়ত, শিশুর মাথার পরিধির সঙ্গে বুকের ছাতির পরিমাপগত সম্পর্ক। জন্মকালে বলিষ্ঠ শিশুর মাথার পরিধি তার বুকের ছাতির পরিধির চেয়ে বড়ো হয়ে থাকে। কিন্তু ১ বছর বয়স হলে এই দুই পরিধির মাপ সমান হয়ে আসে অর্থাৎ দুটির বেলাতেই ১৭″—১৯″ ( ৪৩ – ৪৮ সেমি ) মত।

চতুর্থত, শিশুর হাতের ওপরদিকের মাঝামাঝি জায়গার পরিধির মাপ। সাধারণত শিশুর জন্মকাল থেকে ১ বছর বয়সের মধ্যে তার ওপর-হাতের মাঝ-অংশের পরিধির মাপ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে মোটামুটি হিসেবে ৪ ইঞ্চি ( ১০ সেমি ) থেকে বেড়ে হয় ৬ ইঞ্চির (১৫ সেমি) মত। তারপর ৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই পরিমাপ প্রায় একই রকম থাকে।

বাড়ন্ত শিশুর আরও কিছু কিছু লক্ষণ আছে যেগুলি পরিমাপ-যোগ্য না হলেও লক্ষণীয়।

(ক) দেড় মাস বয়স থেকে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে সজাগ হতে শুরু করে। কাছাকাছি কোনো রঙীন বা চলন্ত জিনিসের দিকে সে নজর রাখতে পারে। কোনো দিক থেকে জোরে শব্দ হলে সে সেই দিকে মাথা ঘোরায়। চোখ আর মাথা শরীরের দুদিকে ৯০° ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাতে পারে। মুখের স্বাদ আসে। শুধু জল দিলে

সে খেতে চায় না, কিন্তু জলে চিনি মিশিয়ে মিষ্টি করে দিলে খেতে চায়। স্পর্শ বোধের দরুন বিছানার চেয়ে কোলের গরমে আরাম পায়।

(খ) ২ মাস বয়সের পর থেকে গলা দিয়ে কিছু কিছু আওয়াজ করতে পারে। যেমন-আ, উ।

(গ) ৩ মাস বয়স থেকে শিশুর ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

৩ মাস বয়স পর্যন্ত যদি কোনো শিশুর এই সব শারীরিক লক্ষণ সঠিক প্রকাশ না পায় তাহলে তার বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে না বলে মনে করা যেতে পারে।

শিশুর ৩ মাস বয়স থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে আরও কিছু কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যেগুলি তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির আবশ্যিক পরিণতি। যেমন,—

(ক) ৩ মাস থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে শিশু উপুড় হতে পারে। উপুড় হয়ে ঘাড় ও মাথা শক্ত করে ধরে রাখতে পারে এবং ইচ্ছামত দুপাশে ঘোরাতেও পারে।

(খ) বুকে ভর দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

(গ) কোনো জিনিস নজরে পড়লে তা হাতের নাগালের মধ্যে পাবার চেষ্টা করে, মুখে দেবার চেষ্টা করে কিংবা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিতে পারে।

(ঘ) হাত ধরে তুললে পা শক্ত করে দাঁড়াতে পারে ; আবার কোনো কিছুর সাহায্যে বসে থাকতে পারে।

(ঙ) ৬ মাস বয়সের মধ্যেই শিশু তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, যেমন আনন্দ, ভয়, বিরক্তি ইত্যাদি। এই সময়েই শিশু চেনা অচেনা বুঝতে পারে।

শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে তার মানসিক বিকাশের স্বাভাবিক লক্ষণগুলি হল—

(ক) তার নাম ধরে ডাকলে বুঝতে পারে। পরিচিত গলার আওয়াজ ধরতে পারে এবং একটি দুটি করে স্বর বারবার উচ্চারণ করতে পারে।

(খ) এই বয়সে শিশু হামা দিতে পারে এবং কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই একা-একা বসতে পারে।

(গ) ৯ মাস বয়সে শিশু কোনো কিছু ধরে দাঁড়াতে শেখে এবং ধরে ধরে এক পা দু পা করে হাঁটতেও পারে।

(ঘ) ক্রমে ক্রমে ১ বছর বয়সের মধ্যে শিশু দু-একটি অর্থপূর্ণ শব্দ বলতে শেখে, নিজে নিজে হাঁটতে ও ছুটতে পারে, আপন-পর বুঝতে শেখে।

## ॥ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি ॥

### খাদ্য কি ?

শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনার আগে সাধারণভাবে খাদ্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে, আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য। আমাদের সহজাত ও অভ্যাসগত অভিজ্ঞতা থেকে খাদ্য সম্পর্কে সকলেরই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে যার নতুন করে পরিচয় বা টীকা নিষ্প্রয়োজন। চর্ব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় অর্থাৎ যা চর্বন করা হয়, চোষণ করা হয়, লেহন করা হয় অথবা পান করা হয় এমন যে কোনো বস্তু যদি আমাদের ক্ষুধা মেটায়, রসনা পরিতৃপ্ত করে এবং শরীরের পরিপোষণে সাহায্য করে তবে তা-ই আমাদের খাদ্য। আমাদের খাদ্য প্রধানতঃ শক্ত এবং তরল হয় আর তা আমরা চিবিয়ে, চুষে, কিংবা চেটে খেয়ে থাকি অথবা পান করে থাকি। আমাদের 'পেয়' বা পানীয়ের মধ্যে জল যদিও ঠিক খাদ্য নয় তবু খাদ্যেরই সহযোগী। খাদ্য শক্ত কি তরল তা চোখে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু এছাড়া খাদ্যের অপর তিনটি গুণ আছে যা উপলব্ধি বা অনুভব করা যায় এবং যা দেহের কাজকর্মের পক্ষে অপরিহার্য। যেমন, খাদ্য আমাদের ক্ষুধার তাড়না ( impulse ) প্রশমিত করে ; স্বাদ ও গন্ধের জন্যে খাদ্য রসনারুচিকর হয় ; এবং আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে ভাঙ্গাগড়া

চলেছে সেই শারীর-ক্রিয়ার জন্যে দরকার খাদ্যের। শক্ত ও তরল, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য ও পেয় ক্ষুধানিবারক, রসনারোচক এবং শরীরের পরিপোষক—এই হল খাদ্যের সামগ্রিক পরিচয়।

ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ এমন কিছু খেতে পারে বা খেয়ে থাকে যা 'খাদ্য' নয়। আবার রসনারুচিকর না হলে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুই হবার মত যথার্থ আস্বাদগুণ থাকে না খাদ্যের। অপরদিকে যতই রুচিকর হোক, শারীরিক পরিপোষণে সাহায্য না করলে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মাত্রই খাদ্য হয় না।

শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে ভাঙ্গাগড়া চলেছে সেই শারীর-ক্রিয়ার সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্কের প্রশ্নে খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা শুরু হয় এবং জন্ম হয় পুষ্টিবিজ্ঞানের। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা খাদ্যের মধ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক উপাদানের সন্ধান পেলেন, যেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের শরীরের কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্নায়ু, কোষ, গ্রন্থি ইত্যাদি এই রাসায়নিক উপাদানগুলির দ্বারা গঠিত, পরিচালিত, পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। এই উপাদানগুলিকেই এক কথায় খাদ্যের পুষ্টি-উপাদান বলা যেতে পারে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, এই পুষ্টি-উপাদানগুলির কোনো কোনোটি বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে। কোথাও কোনোটি কম, কোনোটি বেশী; কোনো খাদ্যে একটি উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী, অপরটি নামমাত্র। যে উপাদানগুলি শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি সঠিক মাত্রায় পেতে হলে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে তাদের আনুপাতিক সমতা বা সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং তার জন্য দরকার উপযুক্ত সুষম খাদ্য নির্বাচন ( balanced diet )।

**খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ঃ**

খাদ্য থেকে আমরা যে বিশেষ রাসায়নিক উপাদানগুলি পেয়ে থাকি সেগুলি হল—

(ক) প্রোটিন বা আমিষ

(খ) স্নেহ বা চর্বি জাতীয় উপাদান

(গ) শ্বেতসার বা শর্করা ( চিনি )

(ঘ) ধাতব লবণ বা খনিজ উপাদান

(ঙ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

(চ) জল

এই খাদ্য উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই আমাদের শরীরে কোন-না-কোন ভাবে পুষ্টি যোগায়। সেই কারণে এইগুলিকে খাদ্যের পুষ্টি-উপাদানও বলা যায়।

শরীরের ওজন অনুযায়ী এই উপাদানগুলির ভাগ সাধারণত কার কতটা তারও একটা হিসেব নিয়ে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের ওজনের শতকরা ৬০ ভাগের মত জল, ১৮ ভাগের মত প্রোটিন, ১৫ ভাগের কিছু বেশী স্নেহ বা চর্বি, ৩ ভাগের মত ধাতব লবণ, ১ ভাগেরও কম শ্বেতসার বা শর্করা এবং বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ ( vitamin ) স্বল্প মাত্রায় থাকে। অবস্থাবিশেষে এই ভাগ বা মাত্রার তারতম্য অবশ্যই হতে পারে।

এখন দেখা যাক এই উপাদানগুলি আমাদের শরীরে প্রধানত কি কি কাজ করে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে এই উপাদান-গুলির প্রয়োজন কি রকম।

প্রোটিন ঃ

প্রথমেই ধরা যাক প্রোটিনের কথা ; কেন না প্রোটিন একটি অতি মূল্যবান উপাদান এবং বিশেষ করে শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শরীরের মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, আন্ত্রিক অবয়ব এবং পেশীসমষ্টি প্রধানত প্রোটিন দিয়েই তৈরী। যেহেতু এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে সেজন্য এদের প্রোটিনের ক্ষয়পূরণেরও প্রয়োজন প্রতিক্ষণ। শৈশবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে গঠনশীল ( formative ) এবং ক্রমে ক্রমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যতই

সক্রিয় হয় ততই তাদের ক্ষয়পূরণের প্রয়োজনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই কারণে শিশুর পক্ষে প্রোটিন একটি অপরিহার্য খাদ্য উপাদান। তার শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য প্রথম প্রয়োজন।

এই প্রোটিনের অভাবে শিশুদের যে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটে চিকিৎসার পরিভাষায় তাকে বলে 'কোয়াশিয়রকর' ( kwashiorkor )। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশীর ভাগ জুড়ে রয়েছে যে উন্নতিশীল দুনিয়া সেখানে প্রোটিনের অভাবজনিত এই শিশুরোগ অত্যন্ত প্রকট। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হবে। এই রোগ হলে শিশুর শরীরের পেটের অংশ ফুলে যায়, হাত-পা শীর্ণ হাড়-জিরজিরে হয়ে যায়, মাথার চুল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং গায়ের চামড়া খসখসে ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সব চেয়ে বড় কথা হল, প্রোটিনের অভাবে শিশুর শরীরে প্রতিরোধশক্তি কমে যায় আর তার ফলে শিশু যে কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং তার জীবন সংশয় ঘটতে পারে।

প্রোটিন আবার ২০টি রাসায়নিক উপাদানের সমষ্টি। এদের বলে অ্যামিনো এসিড ( amino acid )। এদের মধ্যে ৮টি উপাদান শরীরের পক্ষে বিশেষ জরুরী। এই উপাদানগুলি শরীর নিজে থেকে তৈরী করে নিতে পারে না। কাজেই একমাত্র খাদ্যের মাধ্যমেই এই ৮টি উপাদান শরীরকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রোটিনের পুষ্টিমূল্যের অনেকখানি নির্ভর করে এই অ্যামিনো অ্যাসিড-এর ওপর। শিশুর খাদ্য হিসেবে মায়ের বুকের দুধই তার প্রয়োজনীয় প্রোটিনের শ্রেষ্ঠ উৎস। একটু আগে প্রোটিনের অভাবজনিত যে শিশুরোগের কথা আলোচনা করেছি সেই কোয়াশিয়রকর রোগের জন্যেও প্রধানত দায়ী শিশুর মাতৃদুগ্ধের অধিকার থেকে বঞ্চিত বা বিচ্যুত হওয়া। দেখা গেছে, এশিয়া-আফ্রিকার বেশীর ভাগ দেশের সাধারণ দরিদ্র সমাজে মায়ের কোলে শিশু একটু বড়ো হতে-না হতেই আর একটি শিশু এসে যায়। তার ফলে আগের শিশুটি মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়। মায়ের বুকের দুধের

স্বাভাবিক যোগান না পেয়ে সে রোগা হয়ে যায়, তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, ক্ষিদে থাকে না এবং প্রায়ই সে পেটের অসুখে ভুগতে থাকে। এইভাবে তার শরীরের প্রতিরোধশক্তি দ্রুত হ্রাস পায় এবং সে তখন যে কোন মারাত্মক অসুখের সহজ শিকারে পরিণত হয়। শিশুর প্রোটিন-খাদ্য হিসেবে মায়ের বুকের দুধই যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ একথা আজ নিঃসন্দেহে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত।

'ক্যালরী' সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে, শরীরের শক্তির পরিমাপকে আমরা ক্যালরীর মানে প্রকাশ করে থাকি। শরীরের বৃদ্ধি ও কাজকর্মের জন্য চাই শক্তি। এক থেকে দু'বছর বয়সের একটি বাড়ন্ত ও চঞ্চল শিশুর প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০০ ক্যালরী শক্তির দরকার। শিশুর প্রতি কেজি ওজন পিছু দৈনিক ১২০ ক্যালরীর মত শক্তি স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সাধারণত প্রয়োজন। হিসেব-মত শিশুর এই ক্যালরীর চাহিদার শতকরা অন্তত ৮ থেকে ১০ ভাগ পাওয়া চাই প্রোটিন থেকে। প্রোটিন-ক্যালরীর এই হিসেব সব বয়সের শিশুদের পক্ষেই যথেষ্ট। বলা যেতে পারে এক বছর বয়সের একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর ওজন ৯-১০ কেজি এবং তার দৈনিক শক্তির চাহিদা ১০০০—১২০০ ( ক্যালরী ; এর ) মধ্যে ৮০—১২০ ক্যালরীর যোগান আসা উচিত দৈনিক প্রোটিন খাদ্য থেকে। দুঃখের কথা, সারা পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির বেশীর ভাগ বাবা-মায়েরই তাদের শিশুদের পুষ্টিহীনতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ; এমন কি যাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদেরও এ ব্যাপারে অজ্ঞতা ভয়াবহ। পরিবারে ও সমাজে যাঁরা শিশুদের যথার্থ অভিভাবক ও পালক তাঁদের অনেকের চোখেই শিশুদের এই অপুষ্টির চেহারাটা অনেকখানি অগোচরে রয়ে গেছে।

**প্রোটিনের উৎস ঃ**

নবজাত শিশু তার ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ থেকেই পর্যাপ্ত প্রোটিন পেতে পারে। শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যে অবিকল্প সে

কথা আগেই বলেছি। এবিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, মায়ের বুকে দুধের যোগান যাতে যথেষ্ট ও অব্যাহত হয় তার জন্য দুটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত মায়ের নিজের পুষ্টি এবং দ্বিতীয়ত মায়ের পরবর্তী সন্তান সম্ভাবনা বিলম্বিত রাখা। মায়ের কোলের সন্তানটি বড় হয়ে ওঠার আগেই মা যদি আবার সন্তানবতী হন তাহলে স্বভাবতই সেই কোলের শিশুটি তার প্রাপ্য মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হবে।

শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে তার প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে বুকের দুধ ছাড়াও কিছু কিছু পরিপূরক খ্যাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুদের ৬ মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের রীতি আছে। বাঙালী অন্ন-ভোজী। কবি ভারতচন্দ্রের সেই প্রবাদপ্রতিম প্রসিদ্ধ উক্তিটি বাৎসল্য-বিধুর অনেক বাঙ্গালীরই প্রাণের কথা "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" এই ভাত বা তণ্ডুল জাতীয় শস্যদানায় প্রোটিন আছে ৭ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ। চালে ৭ শতাংশ এবং গমে প্রায় ১২ শতাংশ। ভাত বা হাতে গড়া আটার রুটির সঙ্গে শিশুকে যদি শুঁটি-জাতীয় শস্য যেমন ডাল খেতে দেওয়া হয় তাহলে তার খাদ্য আরও প্রোটিনসমৃদ্ধ হবে। আমাদের দেশে চাল-ডালে মিশিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। চাল-ডালের এই অভিন্ন মিশ্রন শুধু মুখরুচির দিক থেকেই নয়, প্রোটিন-পরিপুষ্ট সহজলভ্য মুখ্য খাদ্য হিসেবেও উপাদেয়। আসলে ডালশস্য, ছোলা মটর, কড়াইশুঁটি এসবে প্রোটিন আছে ২০—১৫ শতাংশ। আজকাল সয়াবীনের প্রচলন বাড়ছে। এই সয়াবীনে প্রোটিনের মাত্রা অনেক বেশী—প্রায় ৪০ শতাংশ। তাছাড়া বাদামেও যথেষ্ট প্রোটিন আছে। শতকরা ২৫ ভাগ। এই যে সব খাদ্যের কথা বলা হল এগুলি সবই উদ্ভিদজাত যাতে প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। আমাদের শিশুখাদ্যের তালিকায় সহজে স্থান করে নিতে পারে এমন উদ্ভিজ্জখাদ্য ও তাদের প্রোটিনের ন্যূনতম পরিমাণ নীচে দেওয়া হল :—

| খাদ্য | প্রোটিনের পরিমাণ (গ্রাম হিসাবে) |
| --- | --- |
| চাল | ৭—৮% |
| গম | ১২% |
| গম ( বালগার ) | ৮% |
| সুজি | ১০% |
| ডাল ( মুসুর ) | ২৫% |
| ডাল ( মুগ ) | ২৪% |
| ডাল ( কালোকলাই ) | ২৪% |
| ডাল ( কলাই ) | ২০% |
| ডাল ( ছোলা ) | ১৭% |
| সয়াবীন | ৪০—৪৩% |
| চীনাবাদাম | ২৫% |
| বীন, সিম | ৭% |
| সজনেডাঁটা | ৬% |

বলা বাহুল্য এই হিসেবে 'শতাংশ' বলতে বোঝানো হয়েছে মোট একশত গ্রাম নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুর বিশেষ ভাগ বা অংশ ; ধারণার সুবিধার জন্য দশমিক মানের প্রান্তিকতা বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে রান্নার ফলে কোনো খাদ্যের উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের নির্ধারিত ভাগের তারতম্য ঘটতে পারে। মনে রাখতে হবে, ভাতের মণ্ড, ডালের স্যুপ বা সুরুয়া আটা বা সুজির রুটি, বীন বা সিম জাতীয় সব্জি, বাদামের গুঁড়ো বা তা দিয়ে তৈরী খাবার শিশুর খাদ্য তালিকায় থাকলে তার প্রোটিনের চাহিদা অনেকটা মেটানো যায়।

**প্রাণীজ প্রোটিন ঃ**

আমরা প্রোটিনের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ( vegetable protein ) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে সাধারণ গার্হস্থ্য সংসারে শিশুদের উপযোগী এই সব উদ্ভিদ্‌জাত

খাদ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এগুলি দামেও সুলভ। যখন আমরা একথা বলি তখন আমরা প্রাণীজ খাদ্যের কথা ভেবেই তুলনামূলক মূল্যায়নের চেষ্টা করি। প্রাণীজ খাদ্য বলতে আমরা প্রধানত বুঝি মাছ, মাংস, ডিম, মেটে ; দুধও প্রাণীজ সম্পদ আর তাই দুধ বা দুধের তৈরী খাবারকেই প্রাণীজ খাদ্য বলা যেতে পারে যদিও মাছ, মাংস, ডিম বা মেটের মত আমিষ খাদ্য বলতে যা বোঝায় দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য সেই জাতীয় নয়। এক কথায় প্রাণীজ খাদ্য আমাদের দেশে মহার্ঘ অর্থাৎ সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতায় তা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। শুধু আমাদের দেশেই নয়, প্রায় সব উন্নতিশীল দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে যে বিপুল জনসমষ্টি বসবাস করে তাদের সকলেরই এই একই অবস্থা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির চিত্রটা ঠিক বিপরীত। আমাদের মত উন্নতিশীল দেশের মানুষদের যখন দুবেলা সাধারণ আহারের জন্য উদ্ভিদজাত খাদ্যের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে হয় তখন উন্নত দেশগুলির মানুষদের খাদ্যতালিকায় প্রাণীজ খাদ্যেরই প্রাধান্য।

আমাদের দেশ নদীমাতৃক। তাই এদেশের মাটিতে শস্যফসলের উৎপাদনের প্রভূত সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি জলজ প্রাণী অর্থাৎ মাছের প্রজনন বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ। বলতে গেলে নদ-নদীর দুকূলে যে সব লোকালয় বা জনপদ গড়ে উঠেছে তাদের অধিবাসীদের অধিকাংশই মৎস্যভুক। বাংলা নদীবিধৌত দেশ এবং বাঙ্গালীরা শুধু অন্নভোজীই নয়, তারা মৎস্যভোজীও। সম্পন্ন গৃহস্থের কথা বাদ দিলেও আগেকারকালে সাধারণ গৃহস্থের আহারে ছোটো বা চুনো মাছ অন্যতম পদ হিসেবে আদৃত হত। 'মইলি মচ্ছা' আদি বাংলায় মউরলা মাছেরই প্রতিরূপ আর তখনকার দিনে লোককাব্যে ছড়ায় প্রবাদে সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের আহারের বর্ণনায় এই জাতীয় মাছের উল্লেখ পাওয়া যায় যদিও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবি মানুষের সংসারে মাছ সব ক্ষেত্রে সুলভ ছিল না। একালেও সাধারণ মৎস্যভুক বাঙ্গালীর কাছে মাছ প্রায়শ দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন পশু পাখি শিকার করে মাংস-ভক্ষণের রীতি সেকালে শবরাদি সমাজে প্রচলিত ছিল। 'দুগ্ধ সুজাতা'

অর্থাৎ আদি বাংলায় যাকে বলা হত ঘরে-পোষা গরুর দুধ তাও ছিল স্ত্রী বা কান্তার স্বহস্তে পরিবেশিত পুণ্যবান গৃহস্থের আহারের অঙ্গ। একালে অবশ্য নির্ভেজাল বা অবিমিশ্র গরুর দুধের সরবরাহও সীমিত। এরকম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সমেত এদেশের প্রায় ১১ কোটি ৯০ লক্ষ শিশু, যাদের বয়স ৬ বছরেরও কম, প্রাণীজ প্রোটিনের ওপর নির্ভরতা হারাতে থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে শিশুখাদ্যের তালিকায় মাছ-মাংস-ডিম-দুধ নিয়মিত যোগানো সম্ভব না হলেও এই সব খাদ্যের পুষ্টিগুণ বা প্রোটিনমূল্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেই কারণে শিশুখাদ্যে এদের সম্ভাব্য যোগানের ব্যবস্থা যেমন প্রতিটি শিশুকল্যাণকামীর নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব তেমনি শিশুদের জন্যে এই সব খাদ্যের সাধ্যমত সংস্থান করা পারিবারিক ব্যয়সংকুলানের ক্ষেত্রেও বিচক্ষণতার দাবী রাখে। এই সব নানা দিক বিবেচনা করে এখন বিকল্প খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাণীজ খাদ্য যদিও প্রোটিন সমৃদ্ধ তবু প্রোটিন ছাড়াও এতে অন্যান্য পুষ্টি-উপাদানও পাওয়া যায়।

মুরগীর মাংসে প্রোটিন আছে শতকরা ২৫ গ্রাম
অন্যান্য মাংসে .... .... .... .... ১৮—২১ গ্রাম
বিভিন্ন মাছে .... .... .... .... ১৬—১৭ গ্রাম
পাঁঠার মেটেতে .... .... .... .... ২০ গ্রাম
মুরগীর ডিমে .... .... .... .... ১৩ গ্রাম
দুধ ও দইয়ে .... .... .... .... ৩—৪ গ্রাম

শিশু বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্যান্য উদ্ভিদজাত খাদ্যের সঙ্গে ডিম, মেটে, মাছ, মাংস ও গরুর দুধ দিতে হবে সুষম পারিমাণে।

### স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ঃ

স্নেহ বা চর্বি সাধারণত শরীরের ওজন অনুযায়ী যত ক্যালরি শক্তি যোগায় তা প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট ( চিনি বা শর্করা ) থেকে পাওয়া ক্যালরির দ্বিগুণ। বলতে গেলে স্নেহ বা চর্বিই ক্যালরির প্রধান

যোগানদার। এই উপাদানটির মধ্যে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দুরকম রাসায়নিকের সন্ধান পেয়েছেন। গ্লাইসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিড। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দু'রকম খাদ্য থেকেই স্নেহ বা চর্বি পাওয়া যায়। ঘি, তেল, মাখন ইত্যাদি চোখে দেখেই বোঝা যায় যে এগুলি স্নেহ পদার্থ। আবার মাছ, মাংস, বাদাম ইত্যাদি খাদ্যের স্নেহ অংশ অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি দেখে বোঝা যায় না ঘি, তেল, মাখনের মত। এই পদার্থটি কঠিন ও তরল দুরকম অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন চর্বি ও তেল। উদ্ভিজ্জ তেল প্রাণীজ চর্বির চেয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। মেটে, মাছ, ডিমের কুসুম ও দুধের সমৃদ্ধ স্নেহপদার্থ শিশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী।

স্নেহ বা চর্বি ( fat ) শরীরে শুধু যথেষ্ট ক্যালরিই সরবরাহ করে না, এর আরও দুটি উপকারিতা আছে। এই স্নেহ বা চর্বি শরীরে জমিয়ে রাখা যায় এবং পরে কোনো সময়ে প্রয়োজন হলে তা থেকে ক্যালরির যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া কিছু ভিটামিন যেমন ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এই চারটি স্নেহ বা চর্বির সাহায্যেই দ্রবীভূত হয়ে শরীরে সংবাহিত হয়। মনে রাখতে হবে উল্লিখিত এই চারটি ভিটামিন শিশুর শরীরের পক্ষে প্রয়োজন। স্নেহ বা চর্বি সহযোগে সহজে দ্রবণীয় বলেই এই চারটি ভিটামিনের কার্যকারিতা স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

**চিনি বা শর্করা ( carbohydrate ) :**

চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্যকে ক্যালরি যোগানের মূল উৎস বলা যেতে পারে। আমরা আগেই দেখেছি একটি এক বছরের শিশুর কমপক্ষে ১০০০ ক্যালরি শক্তির দরকার এবং এক বছর বয়সের পর থেকে প্রতি বছরে তাকে অন্তত দৈনিক ১০০ ক্যালরির মত বেশী শক্তির যোগান বিভিন্ন খাদ্য থেকে পেতে হবে। একটি ৫ বছরের শিশুর মোটামুটি হিসেবে তাহলে দৈনিক ১৪০০ ক্যালরী শক্তির দরকার আর এই শক্তির মূল যোগানদার চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য। চিনি, গুড় ইত্যাদি ছাড়াও দানাজাতীয় শস্য, সব্জি ও ফলে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

পাওয়া যায়। চাল, গম, সুজি ইত্যাদি দানাজাতীয় শস্যে ( grains ) শর্করার ভাগ শতকরা ৭০ থেকে শতকরা ৭৯। ডালশস্যে শতকরা ৫৬-৬০ ভাগ। আলুতে শতকরা ২২ ভাগ। রাঙাআলুতে শতকরা ২৮ ভাগ। পাকাকলায় শতকরা ২৭ ভাগ। শুকনো খেজুরে শতকরা ৭৫ ভাগ। পাকা গমে শতকরা ১৭ ভাগের মত। পেয়ারায় শতকরা ১১ ভাগ।

আমাদের শিশুদের সারাক্ষণ হাত-পা নাড়া-চাড়া করার জন্য ক্রমাগত যে পেশী সঞ্চালন হয় তাতে প্রয়োজনীয় ক্যালরির যোগান বজায় রাখতে শর্করা জাতীয় খাদ্যই বেশী কার্যকর। অপরদিকে শরীরের উত্তাপ বজায় রাখতে প্রোটিন বা চর্বিজাতীয় ( fat ) খাদ্যই বেশী উপযোগী। ঠাণ্ডায় বা শীতের সময় শরীরকে গরম রাখতে কিংবা ঠাণ্ডালাগার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেতে শিশুর পক্ষে প্রোটিন খাদ্য অথবা চর্বি জাতীয় খাদ্য অপেক্ষাকৃত উপকারী।

**ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ঃ**

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ মানুষের শরীরের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য এবং স্নায়ুসমূহকে সুগঠিত ও সক্রিয় রাখার জন্য অপরিহার্য উপাদান। এই ভিটামিনের সাহায্যেই মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বা বিপাক সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভিটামিনের প্রকার ও গুণ বিশেষে সাধারণত ছটি ভিটামিন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এগুলি হল, ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই এবং কে। এই ভিটামিনগুলির বিশেষ কার্যকারিতার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

**ভিটামিন—এ ঃ** এই ভিটামিনটি শিশুর বৃদ্ধির জন্যই শুধু নয়, শিশুর দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ ও স্বাভাবিক রাখতে একান্ত প্রয়োজন। ভিটামিন 'এ'র অভাবে শিশুরা রাত্রিবেলায় কম দেখতে পায়। এদের রাতকানা বলে। হয় জেরপথ্যালমিয়া। নেত্রবর্ত্ম শুকিয়ে যায়, চোখের জলপড়া কমে। অনেক সময় শিশুদের চোখের মণির দুপাশে তেকোনা খসখসে অংশ দেখতে পাওয়া যায়। একে bitot spot

বলে। মণির স্বচ্ছতা কমে আসে, মণি সাদা কাচের মত হয়ে যায়। মণিতে ঘা হয়। এমনকি এই ক্ষত গভীর হয়ে মণি-ফুটো হয়ে যেতে পারে। এটা চোখের এক ধরণের রোগ। ইংরাজীতে keratomalacia বলা হয়। ভিটামিন 'এ'র অভাবে অনেক শিশু অন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫০০০ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ'র অভাবে দৃষ্টিশক্তি হারায়! ছ'মাস বয়স থেকে ছ'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ'র অভাবে দৃষ্টিক্ষীণতা বা দৃষ্টিহানির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। তাই শৈশবের সূচনা থেকেই শিশুর খাদ্যে ভিটামিন 'এ' যথেষ্ট থাকা চাই। দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য যেমন ছানা, মাখন, ঘি, পনীর (cheese) ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ। এছাড়া ডিম, মেটে, কিছু তেলা মাছ ভিটামিন-'এ'র অন্যতম উৎস। টাটকা সবুজ শাকসব্জি, গাজর, কুমড়ো ইত্যাদি হলুদরঙের সব্জি, টম্যাটো, পাকা পেঁপে পাকা আম ইত্যাদি ফলে ভিটামিন 'এ' ভালোই পাওয়া যায়। শিশুর খাদ্যে এই সব পরিমাণমত ও রুচিমাফিক পরিবেশনের গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ এগুলি সংগ্রহের আর্থিক সংস্থান যে সব পরিবারের আছে তাদের শিশুদের বেলায় বেশী পরিমাণে ভিটামিন মানেই কিন্তু বেশী শক্তি বা বেশী ভালো থাকা নয়। তেমনি আবার অধিকাংশ পরিবারে আর্থিক সঙ্গতির অভাবে শিশুদের খাদ্যে ভিটামিন 'এ'র পর্যাপ্ত যোগান প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠ না। রুচির প্রশ্নও আছে। শাকসব্জি যদি বাসি হয় তাহলে তার ক্যারোটিন (carotene) বলে একজাতীয় পদার্থের ঘাটতি পড়ে যা শরীরে ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া রান্নার ফলে, বিশেষ করে ভাজাভাজি করার ফলেও খাদ্যের ভিটামিন-'এ' অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়।

দুধ, দই, ছানা, ডিম, মেটে ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত বেশী দামের খাবার সংগ্রহ করতে না পারলে সাধারণ টাটকা সবুজ পাতা যুক্ত শাকসব্জি ৫০ গ্রামের মত প্রতিদিন খাওয়াতে পারলে শিশুর ভিটামিন 'এ'-র প্রয়োজন অনেকটাই মেটানে সম্ভব।

**ভিটামিন বি ঃ** ভিটামিন 'বি' বলতে এমনকতকগুলি ভিটামিনের

সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলিকে ভিটামিন-বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৪, বি-৫, বি-৬, এবং বি-১২ বলে চিহ্নিত করা হয়। এক কথায় এগুলি ভিটামিন-বি গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। আলাদাভাবে চেনার সুবিধার জন্য এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হলেও সাধারণত এরা একসঙ্গে অর্থাৎ এক গোষ্ঠীভূক্ত হয়েই থাকে।

ভিটামিন বি-১ অথবা থায়ামিন (thiamine) শরীরের রক্ত সংবহন ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকে সচল ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এর অভাব হলে পা ফুলে যায়, পায়ে জল জমে, হৃদপিণ্ড বেড়ে যায়, ক্ষিদে থাকে না এবং বেরিবেরি বলে এক ধরনের রোগ হয়ে থাকে।

ভিটামিন বি-২ অথবা রাইবোফ্ল্যাভিন (riboflvin) হল এই গোষ্ঠীর আরও একটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন যার অভাবে জিভে বা মুখের কোনে ঘা হয়, গায়ের চামড়া শুকিয়ে যায়, ক্ষিদে থাকে না এবং অল্প পরিশ্রমেই শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ভিটামিন বি-৩ বা প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড (pantothenic acid) -এর অভাব হলে নানারকম চর্মরোগ হতে পারে।

ভিটামিন বি-৪, যার অপর নাম কোলিন (choline) শরীরে স্নেহ পদার্থ (fat) এবং প্রোটিন, এই দুটি অপরিহার্য পুষ্টি-উপাদানকে জারিত হতে সাহয্য করে অর্থাৎ এর অভাবে স্নেহ পদার্থ ও প্রোটিন সহজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ফলে যকৃৎ (liver) এবং বৃক্কের (kidney) জটিলতা দেখা দিতে পরে।

এই গোষ্ঠীর অপর একটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন হল নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড (niacin বা nicotinic acid)। এর অভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলোযোগ, স্নায়ু দুর্বলতা ও চর্মরোগ হতে পারে।

ভিটামিন বি-৬ বা পাইরিডক্সিন (pyridoxine ) স্নায়ু-দুর্বলতা, আন্ত্রিক গোলোযোগ ও বিশেষ ধরনের চর্মরোগের কারণ।

ভিটামিন বি-১২ অথবা স্যায়ানোকোবালামিন ( cyanocobalamin ) কোষের পুষ্টি ও পরিণতিতে এবং বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর শরীরের স্নায়ু ও কোষের পুষ্টিতে রক্তসংবহনে, চর্মরোগ প্রতিরোধে, স্নেহ পদার্থ ও প্রোটিন খাদ্য শরীরে গ্রহণীয় করার কাজে ভিটামিন বি সমূহ সমষ্টিগত ভাবে বিশেষ সহায়ক। এই ভিটামিনগুলি সব রকম সবুজ শাকসব্জি, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, গম-ভুট্টা-সুজি ও ডাল, দুধ-মাখন, ডিম-মাংস-মেটে ও মাছ ইত্যাদি খাদ্যে কম বেশী পাওয়া যায়। শিশুর আহারের সঙ্গে এই সব খাদ্য রকমফের ক'রে খাওয়ালে ভিটামিন বি তার শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত মিলবে।

**ভিটামিন সি ঃ** শিশুর সর্দিকাশি এবং নানান রোগ ভোগের সম্ভাবনা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে ভিটামিন সি বিশেষ কার্যকর। এর আর একনাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ascorbic acid)। সবরকম লেবু, পেয়ারা, আমলকি ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। বিভিন্ন শাকসব্জিতে ভিটানি সি থাকে। তবে বেশী রোদে বা উত্তাপে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ঠিকমত সংরক্ষণের অভাবে অথবা রান্নার ফলে ভিটামিন সি বেশ কিছুটা ক্ষয় হয়ে যায়। ভিটামিন সি-এর অভাবে স্কার্ভি বলে একরকম রোগ হতে পারে।

**ভিটামিন ডি ঃ** শিশুদের অস্থির গঠনে ভিটামিন ডি অপরিহার্য। তাদের দাঁতের ভিত শক্ত করতে এবং দাঁতের পংক্তির সুঠাম বিন্যাসের জন্য ভিটামিন-ডি অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভিটামিনের সাহায্যে শরীরে ক্যালসিয়াম-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ধাতব লবণ রক্তের মধ্যে সহজে বিশোষিত হয়। এই ভিটামিন-ডি যদি শিশুর খাদ্যে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় না যাকে তাহলে শিশুর 'রিকেটস' (rickets) এবং অসটিও-ম্যালাসিয়া (osteomalacia) রোগ হয়ে থাকে যার ফলে শিশুর হাড়-এর গড়ন হয় ত্রুটিপূর্ণ।

মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মেটে, মাখন, দুধ ইত্যাদি খাদ্যে এই ভিটামিন কমবেশী রয়েছে। তাছাড়া শরীরের ত্বকে নিহিত বিশেষ কিছু রাসায়নিকের সঙ্গে সূর্যালোকের ক্রিয়ার ফলেও ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই সূর্যালোক শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, তার গঠন ও বৃদ্ধির সহায়ক।

**ভিটামিন-ই ঃ** আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই সুরু হয় শিশুস্বাস্থ্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ। ভিটামিন-ই মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কাজেই প্রধানত গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে ভিটামিন-ই গর্ভস্থ সন্তানেরই পুষ্টির পরিপোষক। ভিটামিন-ই অস্থিসংলগ্ন পেশীকে সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। সবুজ শাকসব্জি, সয়াবীন, অঙ্কুরিত ছোলা, গম এই ভিটামিনের প্রধান উৎস।

**ভিটামিন-কে ঃ** রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে এবং পিত্তরসের স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন ভিটামিন-কে। শীতের সব্জি যেমন কপি, পালং শাক টম্যাটো ইত্যাদি এই ভিটামিনের অন্যতম যোগানদার।

**ধাতব লবণ ( minarals ):**

এবার আসা যাক ধাতব লবণের কথায়। কিছু কিছু ধাতব লবণ আমাদের শরীরের কয়েকটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষায়, তাদের শরীরে গঠন ও বৃদ্ধির জন্য এই খনিজ উপাদান-গুলির মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় হল, লৌহ ( iron ), চুন ( calcium ), ম্যাগনেশিয়াম ( magnesium ), ফ্লুরিণ ( fluorine ), ও আয়োডিন ( iodine )।

রক্তের হিমোগ্লোবিন অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকার লোহিত পদার্থ যা অক্সিজেন বা অম্লজান সংবহন করে তার গঠনের জন্য প্রয়োজন লৌহের। খাদ্যে লৌহঘটিত উপাদানের অভাবে শিশু রক্তাল্পতায় ভুগতে পারে। তাই লৌহ শিশুখাদ্যের একটি প্রধান পুষ্টি-উপাদান এবং শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত জরুরী।

ক্যালসিয়াম শরীরের হাড় ও দাঁতের গঠন ও বিন্যাসে বিশেষ সাহায্য করে। সেই কারণে যে কোনো বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য।

শরীরের স্নায়ু ও পেশীগুলোকে কার্যক্ষম রাখতে দরকার ম্যাগনে-শিয়াম ; থায়রয়েড গ্রন্থী যা বিভিন্ন প্রকার শারীরিক পরিবর্তনের হেতু, তার স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন আয়োডিন ; আর

দাঁতের ক্ষয় রোধ করার জন্য আবশ্যিক ফ্লুরিণ। গন্ধক ( sulfar ) যা প্রোটিনের সঙ্গেই উপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যায় তা ত্বক ও কেশের পক্ষে উপকারী।

লৌহ পাওয়া যায় মাংস, মেটে, ডিম, মাছ, সবুজ শাকসব্জি ও দানাশস্যে। ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় দুধ ও দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাদ্যে আর ছোটো মাছে। সবুজ শাকসব্জিতে পাওয়া যায় ম্যাগনেশিয়াম। আয়োডিন পাওয়া যায় দুধ, সামুদ্রিক মাছ, বীট, বেগুন, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খাদ্যে।

এগুলি ছাড়া হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য ফসফরাস ( phos phorus ), এর উৎস দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, বাদাম ইত্যাদি খাদ্য। তামা ( copper ) প্রয়োজন লোহিত রক্তকণিকা গঠনে এবং পাওয়া যায় চিংড়ি মাছ প্রভৃতি প্রাণীজ খাদ্যে। শরীরে রোগ-প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে পটাশিয়াম যা শাকসব্জি, ডিম ও মাছে পাওয়া যায়। শরীরের ওজন ও জলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং অম্লতা হ্রাসের জন্য দরকার সোডিয়াম ( sodium ) যার উৎস তরিতরকারি, মাছ, ডিম ইত্যাদি।

কিছু কিছু খনিজ লবণ আমরা জল থেকেও পেয়ে থাকি, যেমন ফ্লুরিণ।

জল ঃ

জলের আর এক নাম জীবন। কারণ জলের অভাবে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। শিশুকে পর্য্যাপ্ত জল খাওয়াতে হবে এবং খাওয়াবার আগে জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। জল খাওয়ানোর পাত্রটিও যাতে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জলের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা থাকে বলে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

জলের প্রধান উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলতে হয়। প্রথমত জল শিশুর শরীরের অভ্যন্তর

পরিশোধিত করে। দ্বিতীয়ত শরীরে রক্তের সচলতা বা প্রবহমানতা বজায় রাখে জল। তৃতীয়ত জল শিশুর হজম শক্তিকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। চতুর্থত শিশুর কোষ্ঠ কাঠিণ্য দূর করতে সাহায্য করে জল। পঞ্চমত জল থেকে শিশু তার শরীরের উপযোগী প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ পেয়ে থাকে।

### শিশুর উদারাময় ও জলপূর্তি ঃ

জলের বহুমুখী প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই আধুনিককালে শিশু-দের উদরাময় বা পেটের অসুখ (diarrhea) প্রতিকারের ক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির শিশুদের মধ্যে উদারাময় বা পেটের অসুখের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে আমরা একে আন্ত্রিক রোগ বলেও চিহ্নিত করে থাকি। বিশ্বের শিশুস্বাস্থ্য সমীক্ষার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আধুনিক বিশ্বে প্রতি বছর ৫০,০০,০০০ লক্ষ শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আমাদের দেশেও শিশুদের পেটের অসুখ বা আন্ত্রিক রোগ শিশু-স্বাস্থের এক প্রধান সমস্যা।

এই রোগের মূল কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস, বিশেষত শৌচাদির ব্যাপারে আমাদের অপরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্য্যাপ্ত সরবরাহের অভাব। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশুদ্ধ পানীয়জলের পর্য্যাপ্ত যোগান যদি সুনিশ্চিত করা যায় তাহলে এই রোগ ৫০ শতাংশ নির্মূল করা সম্ভব। আমাদের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসের ফলেও আমাদের পানীয় জল ও খাদ্য সহজে দূষিত হয়ে পড়ে এবং তা থেকেই আমাদের শিশুদের শরীরে পেটের অসুখের বীজাণু সংক্রামিত হয়। আমাদের শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাতে তাদের পানীয় ও খাদ্য কোনোভাবে দূষিত না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক উদ্যোগ নিতে হবে। উন্নতিশীল দেশে এই উদ্যোগের

বিশেষ সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে। পানীয়জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও তার বিশুদ্ধতা রক্ষা যেমন একদিকে দেশগত বা জাতীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা দরকার তেমনি অপরদিকে সেই জল যাতে সতর্ক ব্যবহারে দূষণমুক্ত থাকে তার জন্য জনসাধারণের স্বাস্থ্যশিক্ষার মান উন্নত হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের পেটের অসুখ বা আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশের মত আমাদের দেশেও জলের যোগান ও তার ব্যবহার এই উভয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

আন্ত্রিক রোগ বা পেটের অসুখে একবার আক্রান্ত হলে শিশুর শরীর থেকে ঘনঘন পায়খানার সঙ্গে দ্রুত জল-নিঃসরণ হতে থাকে এবং জলীয় পদার্থের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধাতব লবণও বেরিয়ে যায়। শরীরে জলের অভাবে শিশু ক্রমেই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন শিশুর শরীরে দ্রুত জলের যোগানের দরকার। যথাসম্ভব অপসৃত জলের পরিপূরণের ব্যবস্থা শিশুর প্রাণরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। জল বা যে কোনো তরল পানীয় তখন শিশুকে জীবন সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে একমাত্র অবলম্বন। পেটের অসুখে শিশুর জলপূর্তির জন্য মুখে খাওয়ার মিশ্রণ (oral rehydration solution) বর্তমানে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির শিশুমৃত্যুর প্রতিরোধে এক বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা।

জলশূন্যতা ও জলের যোগান ঃ

শিশুর শরীর থেকে অত্যধিক জলনিষ্কাশনের প্রধান কারণ যে উদরাময় বা আন্ত্রিক রোগ তা থেকেই আবার শিশু সহজে অপুষ্টির কবলে পড়ে। তার কারণ এই সময় শিশুর ক্ষিদে কমে যায় এবং সে যা খায় তাও ঠিকমত হজম করতে পারে না। তাছাড়া শিশুর পেটের অসুখ হলে মায়েরাও তাকে শক্ত খাবার দেওয়া দূরের কথা তরল কিছু, এমন কি বুকের দুধটুকুও দিতে ভরসা পান না। তার ফলে শিশুর অপুষ্টি যেমন দ্রুত ঘনিয়ে আসে তেমনি সেই সঙ্গে বমি,

প্রস্রাব, অতিরিক্ত ঘাম, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জীবন সংশয় উপস্থিত হয়।

ডায়েরিয়া বা উদরাময়ের কারণ অনুসন্ধান ক'রে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এযাবৎ দেখেছেন যে, ২৫ রকমের ব্যাকটিরিয়া বা বীজাণু, ভাইরাস ও পরজীবী এর জন্য দায়ী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সংক্রমণ ঘটে থাকে জল ও খাদ্যের মাধ্যমে। তাই এই রোগ প্রতিরোধে জল ও খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং যে সব কারণে জল ও খাদ্য দূষিত হতে পারে সেগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সব চেয়ে আগে দরকার। কিন্তু শিশু পেটের অসুখে আক্রান্ত হলে তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার আগেই যে ব্যবস্থা শিশুর আরোগ্যের পক্ষে অনিবার্য ফলদায়ক তা হল, সুলভ বা সহজে প্রস্তুত পানীয়ের মাধ্যমে শিশুর শরীরে জলপূরণের স্বীকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থা। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার ব্যবহৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ব্যবস্থার নাম oral rehydration therapy বা সংক্ষেপে ORT এবং এই ব্যবস্থা অনুমোদিত পানীয় বা মিশ্রণের নাম oral rehydratiou solution বা সংক্ষেপে ORS।

এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার আগে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত শিশুর শরীরে জলপূরণের জন্য শিরার ভিতর ইনজেকেসন্ ( intravenous injection ) করার দরকার হত। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না এবং তাও যত সত্বর সম্ভব ততই মঙ্গল। কিন্তু ১৯৬০ সালের পর থেকে শিশুদের পেটের অসুখে ORT বা জলপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় মিশ্রণ খাওয়াবার রীতি প্রচলিত হল। এই রীতিতে শিশুর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি রোধ করতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেল।

### ORS কি ?

এটি সহজ কথায় জলের সঙ্গে নুন-চিনির মিশ্রণ। আসলে এই মিশ্রণের প্রধান উপাদান হল সোডিয়াম ( sodium ) ও গ্লুকোজ

(glucose)। সোডিয়াম ক্লোরাইড ( sodium chloride ), সোডিয়াম বাইকারবনেট ( sodium bicarbonete ) এর সঙ্গে পটাসিয়াম ক্লোরাইড (potasium chloride) ও গ্লুকোজ যোগ করে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে ও প্যাকেটে পুরে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বহুল প্রচলনও হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশের জনস্বাস্থ্যের অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে এই O-R-S মিশ্রণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পাবারও সুবিধা আছে। তবে এই মিশ্রণ বাড়ীতেও তৈরী করে নেওয়া যায় এবং এটাই এর সব চেয়ে বড়ো সুবিধা। বাড়ীতে তৈরীর জন্যে সাধারণ খাবার নুন ও চিনিই যথেষ্ট। একাধিক ধাতব লবণ না পাওয়া গেলেও নুন-চিনি মিশ্রিত পানীয় পেটের অসুখের প্রথম অবস্থায় নিঃসন্দেহে আশানুরূপ কার্যকর।

এক লিটার জলে চা-চামচের আধচামচ খাবার নুন ও চার চামচ চিনি ভালোভাবে গুলে মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে। মিশ্রণ তৈরী করার আগে জল অবশ্যই ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। এই মিশ্রণ শিশুকে একটু একটু করে বারে বারে খাওয়াতে হবে এবং একই মিশ্রণ বারো ঘন্টার বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। এইভাবে বাড়ীতে তৈরী মিশ্রণ শিশুকে খাওয়ালে তার প্রাথমিক বিপদটুকু অবশ্যই কেটে যাবে।

এই মিশ্রণের প্রধান কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মিশ্রণে যে চিনি (glucose) থাকে তার জন্য কঠিন পেটের অসুখেও অন্ত্রের পক্ষে জল ও লবণ শোষণ করতে সুবিধা হয়।

এ ব্যাপারে অর্থাৎ মিশ্রণ তৈরী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। মনে রাখতে হবে চিনির ব্যবহার এক্ষেত্রে শরীরে শক্তি উৎপাদনের জন্য নয়। তাই মিশ্রণে চিনির মাত্রা বেশী দেওয়া উচিত নয়। মিশ্রণকে শিশুর পক্ষে সুস্বাদু করার জন্যও চিনি বেশী দেওয়া ঠিক নয়। বেশী পুষ্টি বা বেশী স্বাদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত চিনির প্রয়োগ কিন্তু বিপজ্জনক ; তাতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে শিশুকে নুন-চিনি মিশ্রিত জল বারে বারে

খাওয়ানো ছাড়াও পাতলা সব্জীর ঝোল, ডালের স্যুপ ইত্যাদি তরল এবং অন্যান্য খাবার অবশ্যই দিতে হবে। এই সময়ে মায়ের বুকের দুধ বন্ধ করা উচিত হবে না। এগুলি মেনে না চললে শিশুর পুষ্টিহানির জন্য শুধু পেটের অসুখকেই দায়ী করলে ভুল হবে।

## মাতৃদুগ্ধ

**মাতৃদুগ্ধ কেন প্রয়োজন ঃ**

যাঁরা পরিণতবয়সী তাঁদের অনেকরই ফেলে আসা শৈশবের প্রতি একটা স্বাভাবিক মমত্ব থাকে যদিও শৈশবের সব স্মৃতিই কিছু সুখকর বা আরামদায়ক নয়। অজানা পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সম্পর্ক একটু একটু ক'রে গড়ে ওঠার আগেই চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সাক্ষাতে, সংঘাতে শিশুর নতুন নতুন অনুভবের তন্ত্রী রণিত হয়ে ওঠার মুহূর্তে প্রকৃতি যেন শিশুর জন্য এক নিবিড় নির্ভরতার আশ্রয় নির্দিষ্ট করে রাখে—যার নাম মাতৃহৃদয়। সেই মাতৃহৃদয়েই নিহিত থাকে শিশুর আপন অস্তিত্বের প্রকৃতিসঞ্জাত রহস্যময় উৎস।

মাতৃদুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য যা শিশুকে শুধু তার পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশেই সাহায্য করে না, মা ও শিশুর মধ্যে গভীর আন্তরিক সম্বন্ধও গড়ে তোলে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিণতি সাধন করতে মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। নবজাত শিশুকে মায়ের স্তন্যদান করা এমনই একটি স্বভাবসম্মত রীতি যা সভ্যতা-বিকাশের আগে থেকেই চলে আসছে। কিন্তু শিল্প-সভ্যতার প্রসার, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও বিলাস উপকরণের বৈচিত্র্য পরবর্তীকালে শিশুকে স্তন্যদানের বিমুখতার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে এবং উন্নয়নশীল প্রাচ্যদেশের পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত সমাজে এই বিমুখতা লক্ষ্যণীয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণ স্বল্পবিত্ত সমাজে এখনও অবশ্য মায়েদের শিশুকে স্তন্যদানের স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করতে দেখা

যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মাকে স্তন্যদানে বিরত থাকতে হয়, যেমন মা যদি নিজে অসুস্থ থাকেন অথবা সন্তান যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা মাকে যদি বাড়ীর বাইরে কাজে বেরোতে হয়। কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘন জনবসতি, রোগব্যাধি এবং মহিলাদের কাজ-কর্মের সুযোগ ইত্যাদি বিস্তার লাভ করায় মায়েদের শিশুকে স্তন্যদানের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সুদৃশ্য কৌটো বা বোতলের আধারে ভর্তি শিশুদের উপযোগী দুগ্ধ মনোরম প্রচারের কৌশলে ব্যবসায়ীরা বাজারে যতই জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছে ততই সাধারণ মায়েরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

শিশুপালনের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেক মা প্রথম সন্তান জন্মের পর বুকের দুধ খাওয়াতে বড় ভরসা পান না। কিংবা মায়েরা মনে করেন, বুকের দুধ শিশুর চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই সব নানা কারণে মায়েরা শিশুকে বুকের দুধ দিতে হয় বিমুখ হন নয় তো বিরত থাকেন। কিন্তু আজ সারা পৃথিবীতে শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহলের নিঃসন্দিগ্ধ অভিমত নতুন করে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

### মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা ঃ

সম্প্রতি বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে মাতৃ-দুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধে পুষ্ট তারা কৃত্রিম বা বোতলের দুধ খেতে অভ্যস্ত শিশুদের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে এবং অপুষ্টি, পেটের অসুখ বা আন্ত্রিক গোলযোগ ও শ্বাসনালির সংক্রমণ ( respiratory infection ) থেকে ভোগে কম। বলা বাহুল্য উল্লিখিত রোগগুলিই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। আরও' দেখা গেছে, মাতৃদুগ্ধ শুধু বেশী পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যদায়কই নয়, শিশুকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করতে উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিশুদের মায়ের বুকের দুধ ও বোতলজাত দুধ খাওয়ার তুলনামূলক মোট তেত্রিশটা সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে লণ্ডন স্কুল অফ্ হাইজিন্ অ্যাণ্ড্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন্-এর ডাঃ অ্যানি হিল এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বুকের দুধ খায় যে সব শিশু তাদের চেয়ে শুধু বোতলের দুধ খায় যারা তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা পাঁচগুণ বেশী এবং যে শিশুরা বুকের দুধ ও বোতলের দুধ দুই-ই খায় তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা তিনগুণ বেশী। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ দেয় যে, মাতৃদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ দুগ্ধ যাতে শিশুর গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশের সব উপাদানই প্রকৃতি সঞ্চিত রেখেছে।

মায়ের বুকের দুধের বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সংক্ষেপে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মায়ের বুকের দুধের বিশেষ কয়েকটি উপকারিতা হল—

১। এই দুধ সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত। অপরদিকে কৃত্রিম দুধ যে বোতলে ভরা হয় অথবা যে পাত্রে খাওয়ানো হয় সেই বোতল বা ঝিনুক-বাটি সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত করা সহজসাধ্য নয়।

২। বুকের দুধের উষ্ণতা শিশুর সম্পূর্ণ উপযোগী। বেশী গরমও নয়, বেশী ঠাণ্ডাও নয়। দেহের উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলে মায়ের বুকের দুধ শিশুর পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

৩। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে শিশুর পেটের অসুখ হয় না। এই দুধে এমন কিছু কিছু উপাদান আছে যা শিশুর অন্ত্রে বীজাণু সংক্রমণ প্রতিহত করে।

৪। মায়ের বুকের দুধে 'ল্যাকটোজ' ( lactose ) নামে এক ধরণের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট থাকে যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে। এই ল্যাকটোজ শিশুর পেটের মধ্যে ভিটামিন-বি বর্গীয় উপাদানগুলি ( vit B-complex ) তৈরী হতে সাহায্য করে। তাছাড়া শিশুর রক্তে লৌহ ও ক্যালসিয়াম, এই দুটি বিশেষ দেহ-

গঠনকারী ধাতব উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে ল্যাকটোজ।

৫। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে মায়ের বুকের দুধে বাইফিডাস ফ্যাক্টর ( bifidus factor ) নামে এক ধরনের উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন যা শিশুর অন্ত্রে ল্যাকটোব্যাসিলাস ( lactobacillus ) নামে এক জাতীয় উপকারী বীজাণু তৈরী করে। এগুলিই ল্যাকটোজকে ভেঙে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে যা শিশুর পেটে ক্ষতিকারক রোগবীজাণুগুলো মেরে ফেলতে সাহায্য করে।

৬। মায়ের বুকে প্রথম দুধ আসার সময় কলোষ্ট্রাম (colostrum) বলে এক ধরনের হলুদরঙের গাড় পদার্থ পাওয়া যায় যা থেকে শিশুর শরীরে বিশেষভাবে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এক অর্থে তাই মায়ের বুকের দুধ শিশুর রোগ প্রতিষেধকেরও কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের এ্যালার্জি, চর্মরোগ, হাঁপানি ইত্যাদি অসুখ এবং বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে মায়ের বুকের দুধ।

৭। এই দুধে প্রোটিনের পরিমান কম থাকলেও যেটুকু থাকে তা শিশু সহজে হজম করতে পারে ; কিন্তু গরুর দুধে কেজিন ( casein ) নামে যে প্রোটিন অংশ বেশী থাকে তা শিশু সহজে হজম করতে পারে না। অন্যদিক টরিন নামে এক ধরণের প্রোটিনের ভাগ খুব বেশী থাকায় তা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া এই টরিন শিশুর পিত্তরসের সঙ্গে মিশে এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে যা শিশুর শরীরের ধমনীকে নরম রাখে যাতে রক্তচলাচলের সুবিধা হয়।

৮। মায়ের বুকের দুধে যে fat বা চর্বি থাকে তাতে linolic acid নামে এবং বিশেষ উপাদান শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপযোগী মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে। এর সাহায্যে শিশুর চামড়াও সুরক্ষিত হয়।

৯। শিশু তার মায়ের বুকের দুধ থেকে সব রকম ভিটামিনই

যথেষ্ট পেয়ে থাকে। ভিটামিন-ডি শিশুর হাড় শক্ত ও মজবুত করে তোলে। এই ভিটামিন ডি মায়ের বুকের দুধে চর্বির পরিবর্তে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে শিশু তা সহজে পরিপাক করে রক্তে টেনে নেয়।

**প্রচলিত ধারণা ঃ**

বুকের দুধ সম্বন্ধে মায়েদের এমন কিছু ধারণা বা বিশ্বাস আছে যেগুলি যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর নয়। প্রথমত মায়েদের অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের বুকে দুধ ঠিকমত আসছে না। এর কারণ অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের নিজেদের মানসিক প্রস্তুতির অভাব। অকারণ আশঙ্কা বা উদ্বেগের ফলে মা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ দেবার মত মানসিক দৃঢ়তা বা প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন না। অথচ, যথেষ্ট প্রস্তুতি, ইচ্ছা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে দু'একদিনের মধ্যে মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ আসা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তবে তার জন্য চাই মায়ের পুষ্টিকর আহার এবং বিশেষ করে জল, দুধ, সাবু ইত্যাদি বেশী করে খাওয়া। এই সহজ সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যে, শিশু যতই বুকের দুধ টানবে ততই তা বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম দুধ আসার মুখে 'কলোষ্ট্রাম' বা যে হলুদ রঙের পদার্থ থাকে তা মায়েদের কেউ কেউ অপরিচ্ছন্ন মনে করে ফেলে দেন। আগেই বলেছি, এই কলোষ্ট্রামই কিন্তু শিশুকে স্বাভাবিকভাবে রোগ প্রতিষেধকের শক্তি যোগায়।

তৃতীয়ত, মায়েদের নিজেদের কারুর অম্বল বা পেট খারাপ হলে তাঁদের শিশুদেরও অম্বল বা পেট খারাপ হবার আশঙ্কায় মায়েরা দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেন। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। মায়ের অম্বল বা পেট খারাপ হলে তাঁর বুকের দুধ খেয়ে শিশুর অম্বল বা পেট খারাপ হবার কোনো ভয় থাকে না।

চতুর্থত, শিশুকে বুকের দুধ দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের কোনো রকম দ্বিধা থাকা উচিত নয় ; কারণ এই দুধ শিশুকে যেমন দেয় পুষ্টি ও পরিতৃপ্তি তেমনি মাকেও দেয় এক আনন্দময় অনুভূতি এবং মা ও শিশুর

মধ্যে গড়ে তোলে এক গভীর মানসিক বন্ধন।

পঞ্চমত, নিতান্ত স্বাস্থ্যের কারণে যদি মায়ের বুকের দুধ শিশুকে দেওয়া সম্ভব না হয় কেবল সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমত বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কেবল মায়ের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। মাতৃস্তন্যে শিশুর জন্মগত অধিকার—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং শিশু পালনের মূল কাঠামো এই সত্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যঃ

মায়ের বুকের দুধে বিভিন্ন পুষ্টি-উপাদান যেমন, প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ বা fat, শর্করা বা carbohydrate এবং ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম যা শিশুর হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য অপরিহার্য কমবেশী কতটা পরিমাণ আছে তার একটা শতকরা হিসেব দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি গরুর দুধের মধ্যে এই সমস্ত পুষ্টি-উপাদানের তুলনামূলক পরিমাণও দেওয়া হল।

| | মায়ের বুকের দুধ (প্রতি ১০০ গ্রামে) | গরুর দুধ (প্রতি ১০০ গ্রামে) |
|---|---|---|
| প্রোটিন | ১·২ গ্রাম | ৩·৩ গ্রাম |
| শর্করা | ৭·০ গ্রাম | ৪·৮ গ্রাম |
| স্নেহ | ৩·৮ গ্রাম | ৩·৭ গ্রাম |
| ক্যালসিয়াম | ৩৩ মিলিগ্রাম | ১২৫ মিলিগ্রাম |

এই হিসেবের সামান্য কিছু হেরফের হতে পারে। তবে গরুর দুধে প্রোটিনের মাত্রা মায়ের বুকের দুধের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বেশী হলেও শিশুর পক্ষে তা হজম করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেই কারণে গরুর দুধে পরিমাণমত জল মিশিয়ে অর্থাৎ প্রতি দুভাগ দুধে একভাগ জল মিশিয়ে পাতলা করে নিতে হয়। দুধ ও জল অবশ্যই ফুটিয়ে নিতে হবে। মায়ের বুকের দুধ তৈরী করে নিতে হয় না। মায়ের বুকের

দূষণমুক্ত দুধ বীজাণুশূন্য। শিশু সহজে হজম করতে পারে। শিশুর গঠনও বৃদ্ধির উপযোগী পুষ্টি-উপাদানে সমৃদ্ধ। শিশুকে রোগ প্রতিরোধের শক্তি যোগায়। এক কথায় মায়ের বুকের দুধের কোনো বিকল্প নেই।

### বুকের দুধ কতদিন দেওয়া যাবে ঃ

যতদিন বুকের দুধ থাকে ততদিনই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণত তিন-চার মাসের পর থেকে বুকের দুধ কমে আসে এবং শিশুর একমাত্র আহার হিসেবে বুকের দুধই তখন আর যথেষ্ট নয়। সেইজন্য শিশুকে তখন থেকে কিছু অন্যান্য খাদ্যও দিতে হয়। আমাদের দেশে শিশুর বয়স ৬ মাসের মত হলেই তার অন্নপ্রাশনের যে সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে তা শিশুর পুষ্টির পরিপূরক ব্যবস্থারই শুভ সূচনা। আসলে শিশুর ৬ মাস বয়স থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধির সময়ে যে প্রচুর পুষ্টির প্রয়োজন তা শুধু ক্ষীয়মান মাতৃদুগ্ধের সাহায্যে মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন কিছু কিছু অন্যান্য আধাশক্ত আধাতরল খাবার শিশুকে খেতে দেওয়া উচিত। যদি ঠিক সময়ে একটু একটু শক্ত খাবার খাওয়া শিশুকে অভ্যাস করানো না যায় তাহলে পরে শিশু তা সহজে খেতে চায় না এবং ক্রমেই ক্ষীণজীবী হয়ে পড়ে। অপরদিকে যদি ঠিক সময়ের আগেই শিশুকে শক্ত খাবার ধরানো যায় তাহলে শিশু আর সহজে মুখ দিয়ে মাতৃস্তন্য টানতে চায় না ; তার ফলে মায়ের বুকে দুধের উৎস ক্ষীণ হয়ে আসে এবং শিশু-স্বাস্থ্যের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মায়েদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, ঠিক কোন সময়ে শক্ত খাবার শিশুকে দেওয়া শুরু করতে হবে। শিশুর ৬ মাস বয়সের কাছাকাছি যখন তার খাবার আগ্রহ খুব বেশী হতে দেখা যাবে, যখন সে বারবার ক্ষিদের জন্যে কাঁদতে থাকবে, বুকের দুধ দেওয়ার পরেও আবার খাবার জন্যে কাঁদবে অর্থাৎ যখন মনে হবে যে, মায়ের বুকের দুধ শিশুর ক্ষুধার তাড়নাকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারছে না তখনই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়াও অন্যান্য শক্ত খাবার খেতে দেওয়া শুরু করতে হবে।

মায়েরা অনেক সময় চিন্তায় পড়ে যান যে, কী খাবার দিয়ে সুরু করবেন। স্থানীয় পরিবেশে ও আবহাওয়ায় যে সব খাদ্য সুলভে পাওয়া যায় তা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। তখনও শিশুর দাঁত না উঠলেও তাকে যদি শক্ত খাবার গুঁড়ো করে বা সিদ্ধ নরম করে খেতে দেওয়া হয় তাহলে তা শিশুর কোনো ক্ষতি করে না।

খাদ্য সম্পর্কে অনেক মায়ের অনেক রকম ধারণা আছে। কেউ মনে করেন, চাল-ডাল-গম ইত্যাদি দানাশস্য বুঝি শিশুর যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকর। কেউ ভাবেন, শিশুকে কলা খাওয়ালে বুঝি তার শ্লেষ্মা বা কাশি হবে। কারুর ধারণা, শিশুর ঠাণ্ডা লাগলে কমলালেবু খাওয়ানো উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়ায় স্থানীয় পরিবেশে যে সব দানাশস্য সহজে পাওয়া যায়, যেমন, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি তা শিশুকে অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। ভাতের নরম মণ্ড, আটার হালকা রুটি, ডালসিদ্ধ ইত্যাদি কিছু সব্জির সঙ্গে শিশুকে খাওয়ালে শিশু তা থেকে স্বাদবৈচিত্র্য ও পুষ্টি দুই পেতে পারবে। শিশুর খাদ্য অল্প তেল দিয়ে রান্না করলে শিশুর কোনো ক্ষতি করে না বরং তা সুস্বাদু হয়। তবে ভাজা বা মশলাপাতি দিয়ে মুখরোচক রান্না শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর এবং গুরুপাক। পাকা কলা, কমলালেবুর রস পরিমিত মাত্রায় শিশুকে নিয়মিত খাওয়ালে শিশুর প্রয়োজনীয় ভিটামিনের চাহিদা অনেকটাই মেটানো যায়। একটু একটু করে শিশুকে ডিমের কুসুম, টাটকা মাছের নরম অংশ, কচি মাংস বা মেটে ইত্যাদি খাওয়ানো অভ্যাস করাতে হবে। বড়োরা যা খান সেই সব বিভিন্ন খাদ্য থেকেই শিশুর পছন্দমত খাবার বেছে নিতে হবে। দেখতে হবে, শিশুর পক্ষে তা যেন সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হয়। ঝালমশলা দিয়ে যেন রান্না করা না হয়। শিশুর খাবার বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা যেন না হয়।

### শিশুর খাবার আগ্রহ বাড়বে কিভাবে ?

অনেক মায়েরই এক অভিযোগ, শিশু খেতে চায় না। শিশুর খাবার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথমত, শিশুকে খাওয়ানোর সময় তার আগ্রহ বা উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে কোনো রকম উপহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা প্রলোভন দেখানো উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, শিশুকে এক সঙ্গে বা একগ্রাসে অনেকখানি খেতে না দিয়ে একটু একটু করে খাওয়ানো এবং কিছুটা খাবার শিশু একবারে সম্পূর্ণ খেয়ে শেষ করলে তবেই পরের বারে আবার তাকে অনুরূপ মাত্রায় খেতে দেওয়া উচিত যতক্ষণ না তার সব খাবারটুকু খাওয়া শেষ হচ্ছে।

তৃতীয়ত, শিশুর খাবার শিশুর পছন্দমত ও রুচিমাফিক মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে মায়েদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবারের রকমফের করতে হবে। প্রথম দিকে অনেক শিশু খাবার মুখে স্পর্শকরামাত্রই থু-থু করে ফেলে দেয়। তার মানে কিন্তু শিশুর খাবারে অরুচি বা অনাগ্রহ নয়। বুকের দুধ খেতে অভ্যস্ত শিশুর পক্ষে প্রথমদিকে আধাশক্ত খাবার খাওয়ার অনভিজ্ঞতাই এর কারণ। তাই এক্ষেত্রে শিশুর খাবার হওয়া উচিত খুব নরম ও মিহি এবং শিশুকে খাওয়াবার সময় তা একটু একটু করে দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে।

চতুর্থত, শিশুকে আলাদা পাত্রে খেতে দিলে শিশুর নিজে খাওয়ার উৎসাহ বাড়বে।

পঞ্চমত, শিশুকে খাওয়াবার সময় তার চারপাশে যেন কোন রকম উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টি না হয়। খাবার পরিবেশ যেন সুখকর ও অনুকূল হয়। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, শিশুর আহারের সঙ্গে জড়িত থাকে স্নেহ যত্ন সুখ ও তৃপ্তির স্বাদ, থাকে নির্ভরতার স্বস্তিবোধ। যদি তার খাওয়ার সময় পরিবেশ কোন কারণে উত্তেজনা-প্রবণ হয়ে ওঠে তাহলে তার প্রভাব শুধু তার অনুভূতিকাতর মনের ওপরেই রেখাপাত করে না, তার হজমশক্তির ওপরও প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তার ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী।

ষষ্ঠত, শিশুর হজমশক্তির পক্ষে আরও একটি ক্ষতিকর প্রভাব

হল শিশুর অনিয়মিত আহার বা খাদ্যভ্যাস। হজম ঠিকমত না হলেই ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। শিশু খেতে চায় না। কাজেই খাবারের প্রতি শিশুর আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে হলে শিশুকে যখন তখন খাওয়ানো অথবা দুটি আহারের মাঝে বারেবারে কিছু খাওয়ানো সঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে একটা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা দরকার।

আলোচ্য প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিশুকে ঠিক কখন মায়ের বুকের দুধ ছাড়িয়ে অল্প অল্প শক্ত খাবার খেতে দিতে হবে সে বিষয়ে বাবা মায়ের ভালো ধারণা না থাকার ফলে উন্নতিশীল দেশগুলিতে বেশীর ভাগ শিশুই বয়সে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়ছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভারতের কোন কোন অংশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা মাত্র দুজন শিশুকে ৬ মাস থেকে ৮ মাস বয়সের মধ্যে প্রায়শক্ত কিছু খাবার খাওয়ানো সুরু করা হয়। বুকের দুধ না ছাড়িয়ে বরং বুকের দুধ চলতে থাকার সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূরক পুষ্টি হিসেবে অন্যান্য খাবারও যে এই সময়ে শিশুর একান্ত প্রয়োজন তা আমাদের অনেকেরই অজানা। আমরা যারা সহরে বাস করি তাদের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র কিন্তু যারা গ্রামে থাকি তাদের বেলায় এটা বাস্তব সত্য। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশুর অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য কখন প্রয়োজন এবং সেই খাদ্যের পরিমাপ কখন কতটা বাড়াতে হবে তার সঠিক নির্দেশের জন্য শিশুর নিয়মিত ওজনের chart বা তথ্যতালিকাই বিশেষ নির্ভরযোগ্য। জন্মের সময় থেকে সুরু করে শিশুর নিয়মিত ওজন নেওয়ার প্রয়োজন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় যখন ওজনের চার্ট থেকে শিশুর বৃদ্ধি বা বিকাশের ঘাটতি চোখে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ নির্ণয় ও নিরাকরণের উপায় সন্ধানের সুযোগ পাওয়া যায়। তাই জন্মের সময় থেকে শিশুর নিয়মিত ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে সঠিক শিশুউন্নয়ন কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

**শিশুর ওজনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ঃ**

শিশুকে মায়ের বুকের দুগ্ধ ছাড়িয়ে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করানোর সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই শিশুর ওজন সাধারণত কমে যেতে সুরু করে। ওজনের এই ক্রমিক অবণতি যদি যথাসময়ে রোধ করা না যায় তাহলে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অপুষ্টি, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, শ্বাসকষ্ট, আন্ত্রিক উপসর্গ, জড়বুদ্ধি ইত্যাদি শিশুর জীবনে শোচনীয় পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

শিশুর ওজন নেওয়ার রীতিমত ব্যবস্থা করতে পারলে এবং তা নিয়মিত তালিকাভুক্ত করে রাখলে সেই তালিকাই বলে দেবে শিশু-স্বাস্থ্যের কখন কী প্রয়োজন। মায়েদের নিজেদের এই ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিশুর ওজন নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে মায়েদের উৎসাহিত করতে পারেন শিশুস্বাস্থ্যের কল্যাণে নিয়োজিত সকল স্তরের সেবাব্রতী ও কর্মীবৃন্দ।

মায়েদের বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গৃহীত শিশুর ওজন যথারীতি নথিবদ্ধ থাকলে সেই নথিই হবে শিশুস্বাস্থ্যের গতি নির্ধারণের সহায়ক। প্রত্যেক মা যদি নিজের কাছে এই ধরনের নথি পত্র রাখতে পারেন তাহলে তা থেকেই তিনি তাঁর শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারবেন। সন্তান সম্পর্কে মায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহকে এক সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করতে একালের বিশেষ কার্যকর উদ্ভাবন হল শিশু-বৃদ্ধির পরিমাপক এই ওজনপঞ্জী। মায়েরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ও তৎপর হলে তাদের নিজেদের উদ্যোগে ও শিশুস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে পাঁচ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন অপুষ্ট শিশুরই স্বাস্থ্যের লক্ষ্যণীয় উন্নতি সম্ভব। এসব সত্ত্বেও শিশুর বৃদ্ধির মূল্যায়ন ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণের নীতি—পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণের মানসিকতা যে এখনও ভালোভাবে গড়ে উঠতে

পারেনি তার কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথম, শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা জানবার উপযোগী সর্বজনগ্রাহ্য কোনো নির্ঘণ্ট সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, শিশুর বৃদ্ধির পরিমাপ কেন দরকার এবং সেই পরিমাপের নির্ঘণ্ট কিভাবে কাজে লাগাতে হবে সে বিষয়ে বাবা-মায়ের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। তৃতীয়ত, এ ব্যাপারে মায়েদের ভালো ভাবে অবহিত করার মত সক্রিয় উৎসাহ শিশুস্বাস্থ্যসেবীদের মধ্যে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের দেশে এ সব নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে শিশুর ওজন সম্বলিত শিশুবৃদ্ধির একটি সুপরিকল্পিত নির্দেশিকা তৈরী হওয়া দরকার যেটি শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করতে পারবে। এ দেশে শিশুস্বাস্থ্যের বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে শিশুর ওজন নথিবদ্ধ করা ও শিশুর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখার নীতি এবং শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তার কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ (**field work**) সুরু হয়েছে।

একটি বাড়ন্ত শিশুর ওজনই তার স্বাস্থ্যের বড় পরিচয়। সঠিক ওজন বাবা-মায়ের নিশ্চিন্ততার আশ্বাস। অপরদিকে শিশুর ওজনের অবনয়ন মানেই বাবা-মায়ের সতর্কীকরণ। এবং যথা সময়ে কারণ নির্ণয় ও নিরাকরণের সংকেত। শিশুর ওজন নেওয়ার রীতিমত ব্যবস্থা তাই শিশুস্বাস্থ্যের কল্যাণে অপরিহার্য।

## রোগ শত্রু

### প্রতিরোধের হাতিয়ার ঃ

এশিয়া আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে যে ছটি শিশুঘাতকের দৌরাত্ম্য সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তারা হল ছটি বিশেষ সংক্রামক রোগ। শিশুরাই এদের সব চেয়ে বড় শিকার। এরা হল ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হাম ও যক্ষ্মা। শিশুঘাতী এই ছটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কৌশলও আবিস্কৃত হয়েছে মানুষের সযত্ন শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে। দেখা গেছে, প্রতিরোধের হাতিয়ার ঠিক-

মত যথাসময়ে প্রয়োগ করতে পারলে এই সব মারাত্মক রোগশত্রুকে নিরস্ত্র করা সম্ভব।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত অনেকটা একই উপায়ে এই কৌশল খাটানো হয়। যে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সেই রোগেরই বীজাণু নিস্তেজ অবস্থায় শিশুর শরীরে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করিয়ে রাখা হয় যাতে বাইরে থেকে রোগশত্রু শিশুর শরীরে ঢুকে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ষীবাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এই যে কৃত্রিম প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা একেই বলে immunization বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা। রোগপ্রতিষেধকের সাহায্যে শিশুর শরীরে সেই রোগেরই antibody বা বিরুদ্ধ শক্তি তৈরী করে তোলা হয়। যে রোগ রোখা অভিযানের লক্ষ্য শিশুর জীবন রক্ষা, সেই রোগের প্রতিষেধক বা ভ্যাক্‌সিন্ (vaccine) পর্যাপ্ত ও সুলভ মূল্যে কিংবা বিনামুল্যে যোগান দেওয়াই হল এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রধান পদক্ষেপ।

ভ্যাক্‌সিন্ বা কৃত্রিম প্রতিষেধক শিশুর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানোকেই আমরা সহজ কথায় বলে থাকি টীকা দেওয়া। সুক্ষ্ম সূচের সাহায্যে শিরার ভেতরে ইন্‌জেক্‌শন করে অথবা মুখে খাইয়ে শিশুকে প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুকে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করার সব চেয়ে সহজ ও সফল উপায় হল টীকা দেওয়া। ছটি মারাত্মক শিশুঘাতকের হাত থেকে টিকে থাকার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুলভ হাতিয়ার হল টীকা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে শুধু টীকা দেওয়ার ফলে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ শিশুর জীবনরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বলাবাহুল্য এই টীকা দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত ছটি বিশেষ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে। টীকার ব্যাপক প্রসার ও দ্রুত সাফল্য সুনিশ্চিত করতে হলে একদিকে যেমন প্রতিষেধকের সরবরাহ অব্যাহত রাখা চাই তেমনি অপরদিকে সেই প্রতিষেধকের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। শুধু প্রতিষেধকের সরবরাহই যথেষ্ট

নয় যদি না তার প্রতিরোধশক্তি অটুট থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ভ্যাকসিন প্রস্তুত হওয়ার স্তর থেকে সুরু করে ভ্যাক্সিন্ যাকে দেওয়া হবে তার কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত প্রতিটি পর্য্যায়ে এর প্রতিরোধশক্তি বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন। সেই তাপমাত্রা যথাযথ রক্ষিত না হলে প্রতিষেধকের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে টীকা দিয়ে যদি বাঞ্ছিত ফল পাওয়া না যায় তাহলে জনসাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস ও হতাশা দেখা দিতে পারে। তাই পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে টীকার ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষেধকের বণ্টন সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত করে তুলতে তার পরিবহণ ও সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাক্সিন্গুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণের জন্য কোল্ড-ষ্টোরেজের ব্যবস্থা, দূরপ্রান্তের কোনো জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায় সেগুলিকে স্থানান্তরিত করার জন্য বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জামের বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি উপকরণগত দিকের উন্নতি ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। জনসাধারণের কাছে প্রতিষেধকের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে সেই সবকর্মী এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতির পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার গুণগত উৎকর্ষতার ওপরেও নির্ভর করে প্রতিষেধকের সাফল্য। এককথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের ব্যবহার, পরিবহন ও সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত, কর্মী ও কর্মধারার সমন্বয় ইত্যাদি মিলে টীকা বা রোগ প্রতিরোধক ওষুধের প্রচলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টীকা নামমাত্র খরচ অথবা বিনা খরচে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সহজ উপায়। টীকা কোনো রোগ সারিয়ে তোলার ওষুধ নয়; রোগের সম্ভাব্য আক্রমন প্রতিরোধ করাই হল টীকার গুণ। সেদিক থেকে টীকা হল সমাজকল্যাণকারী ওষুধ। টীকা রোগপ্রতিরোধক, সমাজকল্যাণকারী ও সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহৃত ওষুধ। তাই এর ব্যাপক প্রসারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি একযোগে কার্যকর করতে যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দরকার তেমনি দরকার সুস্থ নীরোগ নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে

এই সামাজিক ও সমষ্টিসেবামূলক ,ওষুধের ব্যবহারে প্রতিটি নাগরিকের সচেতন উৎসাহ, আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ।

প্রতিরোধ-ভাবনা ঃ

এখানেও আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে কী বিস্তর ফারাক।

স্বাধীনতার ৩০ বছর পর ১৯৭৮ সালে ভারত সরকার থেকে চালু করা হয়েছে সম্প্রসারণ প্রতিষেধক টীকা প্রকল্প রোগগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে এ হল অঙ্গীকার। স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে সব শিশুকে দেওয়া উচিত যক্ষ্মা. পেলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টঙ্কার ও হামের টীকা কিন্তু এই প্রকল্প চালু হওয়ার বছর তিন চার পরেও বাস্তবচিত্রটা কি ? ১৯৮২-৮৩ সালে এক বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুর সংখ্যা ধরা হয়েছে যেখানে প্রায় ২০১ লক্ষ, সেখানে যক্ষ্মার টীকা পায় মাত্র ৩৮ লক্ষ শিশু, ট্রিপল অ্যান্টিজেন পায় ৩৮ লক্ষ শিশু এবং পোলিওর টীকা পায় মাত্র ৩৭ লক্ষ শিশু। ঐ একই বছরে আনুমানিক ২৩৪ লক্ষ গর্ভবতী মায়ের মধ্যে টীকা নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল মাত্র ৬৪ লক্ষের।

এইভাবে যদি আমরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছে পড়ে থেকে এগোই, তাহলে ২০০০ সালের ঊষালগ্নে কেমন হবে ভারতের শিশুদের অবস্থা ? এ কল্পনা করার অধিকার আমাদের সকলের, এবং জনকল্যাণভিত্তিক স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করে যাতে আমাদের সাধ আমরা অনেকাংশে পূরণ করতে পারি, তার জন্যেও দাবি তুলতে হবে। জনস্বাস্বাস্থ্য আন্দোলনের কোন সার্থকতা যদি থাকে, তবে তা সেইখানেই।

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে শিশুদের রোগ প্রতিষেধক কর্মসূচীকে আরও জোরদার এবং সর্বাত্মক করে তোলার উদ্দেশ্যে universal immunizaton programme নামে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের আরও একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার কাজ স্নুরু হয়েছে যে কয়টি রাজ্যে তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। এই কাজ চলবে অব্যাহত ধারায়। শুধু শিশুদের জন্য টীকা প্রতিষেধকের ব্যবস্থাই নয়, অন্তঃস্বত্বা মায়েদের জন্যও

ধনুষ্টঙ্কার রোগের প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। প্রতিটি মা ও শিশু যাতে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টীকা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করতে পারে তার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদেরও বিধিসম্মত ব্যবস্থার সব রকম সুযোগ সুনিশ্চিত করাই এই universal immunization programme বা সার্বিক শিশুরোগ প্রতিরোধ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

টীকা কখন ও কতবার দিতে হবে :

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে শিশুরা সাধারণত তাদের মায়েদের কাছ থেকে কিছু কিছু রোগ প্রতিষেধক শক্তি নিয়েই জন্মায়। মায়েদের নিজেদের শরীরে সঞ্চিত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শিশুর মধ্যেও বর্তায়। তবে শিশুর শরীরের এই সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা তার তিন মাস বয়সের পর থেকেই কমতে সুরু করে এবং তখন থেকে তার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যে সব সংক্রামক রোগে শিশু সহজেই আক্রান্ত হতে পারে তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন একে একে তাদের টীকা কখন কতবার দিতে হবে তার একটা সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হল :—

যক্ষ্মা : শিশু জন্মাবার পর ৯ মাস বয়সের মধ্যে তাকে এই যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের টীকা বি সি জি ভ্যাকসিন্ দিতে হবে।

ডিপথিরিয়া-হুপিং কাশি-ধনুষ্টঙ্কার : শিশুর তিনমাস বয়স থেকেই এই তিনটি রোগের টীকা শিশুকে দিতে হবে। এই তিনটি রোগ খুবই মারাত্মক এবং একযোগে এদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ত্রয়ী প্রতিষেধক একসঙ্গে দেওয়া হয়ে থাকে—যার নাম ট্রিপ্‌ল এ্যান্টিজেন ( triple antigen )। শিশুর তিন মাস বয়স থেকে সুরু করে এক মাস অন্তর একটি করে তিনটি টীকা তিনবার দিতে হবে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে।

পোলিওমায়েলাইটিস্ : এই রোগ শৈশবেই বেশী হয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে শিশু পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। তাই একে শিশু পক্ষাঘাতও বলা হয়। এই রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন শিশুকে খাওয়ানো

হয়ে থাকে। এই ভ্যাক্সিন্ শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে ট্রিপ্‌ল এ্যান্টিজেন ইনজেকস্‌ন দেওয়ার সঙ্গে একই সময়ে অর্থাৎ শিশুর তিন মাস, চার মাস ও পাঁচ মাস বয়সে। এক সঙ্গে ট্রিপ্‌ল এ্যান্টিজেন ও পোলিও ভ্যাক্সিন্ দিলে (প্রথমটি ইন্‌জেক্সন ও দ্বিতীয়টি খাইয়ে দেওয়া হয়) শিশুর কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

হাম : এটি শিশুদের এমন একটি সংক্রামক রোগ যা ৯-১০ মাস বয়স থেকে ৪-৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো বয়সেই হতে পারে। হামের পর সাধারণত পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া ইত্যাদি নানা জটিলতা শিশুদের স্বাস্থ্যহানি, এমন কি জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে। বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলিতে এই রোগই শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ। দুঃখের বিষয় এই রোগের টীকা বা প্রতিষেধক এখনও আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত নেই। শিশুকে ৯ মাস বয়স থেকে ১ বছর বয়সের মধ্যে হামের টীকা দেওয়া দরকার।

বুষ্টার ডোজ : সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য যে ছটি রোগপ্রতিষেধক বা টীকার কথা বলা হল সেগুলি সবই প্রাথমিক টীকা। এই টীকাগুলির সাহায্যে শিশুর শরীরের যে প্রাথমিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তা শিশুর বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমতে থাকে। কাজেই শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আবার চাঙ্গা করে তোলার জন্য নতুন করে টীকা দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একেই বলে বুষ্টার ডোজ। বুষ্টার ডোজ সাধারণত দুবার দিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিষেধক ব্যবস্থার তৃতীয় বা শেষ টীকা দেবার ঠিক ১ বছর পরে প্রথম বুষ্টার ডোজ দিতে হবে। এর পর শিশুর ৪।৫ বছর বয়সে অর্থাৎ শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানোর ঠিক আগে দ্বিতীয় বুষ্টার ডোজ দেওয়া উচিত। বাইরের জগতের সঙ্গে শিশুর মেলামেশার সুরুতে রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে শিশুকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। তবে ৫ বছর বয়সে হুপিংকাশির আশঙ্কা বিশেষ থাকে না বলে শুধু ডিপথিরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক ডাব্‌ল এ্যান্টিজেন দিলেই চলবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে, কোনো

টীকা একবার বা দুবার দেবার পর যদি কোনো কারণে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ টীকা প্রতিরোধক্ষমতা যদি পর্য্যাপ্ত মাত্রায় শিশুর শরীরে সঞ্চারিত করা না যায় তাহলে ফল হিতে বিপরীত হতে পারে এবং শিশুর মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। একটি বা দুটি ডোজ দিয়ে বন্ধ করলে আবার নতুন করে তিনটে ডোজ নিতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুটি টীকার অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান ঠিক থাকে না। এর নানা কারণ থাকতে পারে। টীকার প্রয়োজনীয় ওষুধের সাময়িক অভাব অথবা ওষুধ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শিশুকে টীকা দেওয়ার কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার দূরত্বজনিত অসুবিধা থাকতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোভাব বা তৎপরতা অনুকূল না হওয়ার ফলেও বিলম্বের কারণ ঘটতে পারে। আবার শিশুর বাবা ও মায়ের নিজেদের অসতর্কতা অর্থাৎ শিশুকে টীকা দেওয়ার ব্যাপারে শৈথিল্যের জন্যও টীকা দেওয়া বিলম্বিত হতে পারে। এই কারণগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা দরকার। তবে অবস্থা বিশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় টীকার মধ্যে ৬ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহের ব্যবধান থাকলেও চলবে। তেমনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় টীকার মধ্যে সময়ের ব্যবধান আরও কিছু বেশী থাকলেও ক্ষতি নেই। আসলে টীকা দিতে একটু দেরী হলেও বিভ্রান্ত বা নিরাশ হয়ে একেবারে টীকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া কোনো মতেই উচিত নয়।

শিশুর ১০—১২ বছর বয়সে ধনুষ্টঙ্কার রোগের প্রতিষেধক টিটেনাস টক্সয়েড ইন্‌জেক্‌সন দিতে পারলে ভালো হয়। যাদের হুপিং কাশি হয়ে গেছে কিংবা যাদের মৃগী, তড়কা অথবা খিচুনীর রোগ আছে তাদের ট্রি‍প্‌ল এ্যান্টিজেনের বদলে ডাবল্ এ্যান্টিজেন দেওয়াই সমীচীন। শিশুর ৫বছর বয়সে পোলিও টীকার বুষ্টার ডোজ পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ালে শিশুর শরীরে এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘদিন থাকে। এই ৬টি সংক্রামক রোগ ছাড়াও কলেরা ও টাইফয়েড্-এর প্রতিষেধক টীকা শিশুর ৫ বছর বয়সে একবার দিলে ভালো হয়।

### টিউবারকিউলোসিস ( Tuberculosis ) বা যক্ষ্মা ঃ

যক্ষ্মার বীজাণুর বৈজ্ঞানিক নাম **মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবার-কিউলোসিস**। ছয় ধরনের আছে—মানুষের, গবাদিপশুর, শূকরের, পাখির, ইঁদুরের আর সাপের। মানুষ সংক্রামিত হয় মূলতঃ মানুষের বা গবাদিপশুর যক্ষ্মার বীজাণু দিয়ে। ৯৭ শতাংশ ফুসফুসের যক্ষ্মা সাধারণতঃ মানুষের যক্ষ্মার বীজাণুর সংক্রমণের ফলশ্রুতি, আর লাসিকা গ্রন্থি, হাড় এবং অস্থিসন্ধির যক্ষ্মা হয় গবাদিপশুর যক্ষ্মার বীজাণুর সংক্রমণের ফলে। পাখীর বীজাণু থেকে মানুষের যক্ষ্মা হওয়া খুবই বিরল। ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের যে যক্ষ্মা হয় লাসিকা গ্রন্থির, তার ৮০ শতাংশই হয় গোরুর যক্ষ্মার বীজাণু থেকে। 'অনামা' যক্ষ্মাবীজাণুর কথাও বলা হয়েছে। এগুলো যক্ষ্মার ওষুধের বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে বলে চিকিৎসা দুরূহ হয়।

### মহামারী সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ফুসফুসের যক্ষ্মা সব বয়সেই হতে পারে, পাঁচ বছর পর্যন্ত যে সব শিশুর বয়স, তারা যদি সংক্রামিত রোগীর সংস্পর্শে থাকে, তাহলে তাদের আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা। ৫—১৫ বছরের বয়সের মধ্যে বড় বেশি দেখা যায় না, এর পরে মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তবে মোটামুটিভাবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয়। এটি বংশগত রোগ নয়। কোন কোন উপজাতি বেশি ভোগে। ধূলো, আবর্জনা, গাদাগাদি থাকা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, সূর্যালোকের অভাব, বাতাস চলাচলের অভাব প্রভৃতি রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বুকে আঘাত পেলে অনেক সময় যক্ষ্মার আক্রমণ করতে সুবিধা হয়। হাম (বিশেষ করে যেখানে জটিলতা দেখা দিয়েছে—ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়েছে), হুপিংকফ, প্রভৃতি অসুখের পর যক্ষ্মার আক্রমণ ঘটতে পারে। সংক্রামিত রোগীর কফের সঙ্গে যক্ষ্মার বীজাণু বেরোয়, তা' নাকের ভিতর দিয়ে ঢুকে—ফুসফুস আক্রমণ করে।

**ফুসফুসের যক্ষ্মার লক্ষণ ঃ**

কোন কোন সময় রোগের লক্ষণ নাও থাকতে পারে। অন্য কোন অসুখ দেখাতে গিয়ে একস-রে করলে হঠাৎ ধরা পড়ে। অন্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে—ম্যাজমেজেভাব, রক্তাল্পতা, ধীরে ধীরে ওজন কমে যাওয়া এবং অল্পস্বল্প জ্বর বিশেষ করে বিকালের দিকে। ঠাণ্ডা যা অনেক দিন থেকে লেগে আছে মনে হচ্ছে, দুর্বল করে দিচ্ছে, কাশি সারছে না—এর বেলাতেও যক্ষ্মা সন্দেহ করা যেতে পারে। আবার হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা কোন কোন ক্ষেত্রে যক্ষার প্রথম লক্ষণ। অল্প-স্বল্প হতে পারে, বা বেশিও—বেশি হলে বুঝতে হবে, তলে তলে রোগ এগিয়ে গেছে অনেকদূর। গলার স্বর বিকৃতি—খ্যানখেনে ভাব বা কথা বলতে পারছে না—এক্ষেত্রেও যক্ষ্মার কথা ভাবা যায়। প্লুরিশি হলে বুকে ব্যথা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা হুপিং কফের ঠিক পরেই যক্ষ্মার আক্রমণ হয়েছে।

মুখ্য লক্ষণগুলো হল কাশি অল্পও হতে পারে, বেশিও, কখনো শুকনো কাশি, কখনো বা কফ ওঠে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, নীলচে হয়ে যায় মুখ বা শরীর শুকনো, প্লুরিশি হলে বুকে ব্যথা, রাতে ঘামে ভিজে যায় শরীর, ওজন কমে, ক্ষিদে কম হতে পারে, জ্বর হয়। কফের সঙ্গে রক্ত ওঠে।

রোগ নির্ণয় ঃ (ক) গবেষণাগারে পরীক্ষায় ২৪ ঘণ্টার জমা কফে যক্ষ্মার বীজাণু পেলে রোগ নির্ণয় যথার্থ হয়েছে বলতে হবে। (খ) বুকের একস-রে করেও মোটামুটি ধারণা করা যায় ফুসফুসের কোথায় কতটুকু রোগ বাসা বেঁধেছে। (গ) শুকনো প্লুরিসি বা বুকে জল জমলে যক্ষ্মা হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হয়। (ঘ) স্টেথোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে ফুসফুসের রোগ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পারেন চিকিৎসক (ঙ) কাশির সঙ্গে রক্ত দেখেও মোটামুটি ভাবে সন্দেহ করা উচিত যে যক্ষ্মার আক্রমণ ঘটেছে। উপরে বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে দুটি থাকলে ধরে নিতে হবে যে ফুসফুসের যক্ষ্মা হয়েছে।

**ফুসফুস ছাড়া অন্যান্য যন্ত্র বা তন্ত্রের যক্ষ্মা ঃ**

যক্ষ্মা শরীরের যে কোন যন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে। শিশুদের যক্ষ্মার বেলায় বেশির ভাগই ফুসফুসের যক্ষ্মা। তবে, গোরুর দুধ গরম করে না খেলে বা পাস্টুরাইজ দুধ না খেলে গোরুর যক্ষ্মার বীজাণু সম্বলিত দুধ খেলে গলার বা পেটের গ্রন্থি ( mesenteric glands ) আক্রান্ত হয়—সম্ভবতঃ সে সব জায়গা থেকে যক্ষ্মা ছড়ায় হাড়ে ও অস্থিসন্ধিতে। যক্ষ্মা হতে পারে অন্ত্রের, কিডনী ও মূত্রপথের, জনন পথের, মস্তিষ্কের আবরক পর্দার ( meninges ), সুপ্রারেনাল গ্রন্থির, চামড়ার, ও লিভারের। থাইরয়েড গ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, হৃৎপিণ্ড, এবং মাংসপেশী যক্ষ্মাদ্বারা কদাচিৎ আক্রান্ত হয়।

নাসিকাগ্রন্থি ভেদ করে শিরাতে ঢুকে কখনো কখনো যক্ষ্মা রক্তের ভিতর দিয়ে সারা শরীরে ছড়ায়—এই ধরণের সংক্রমণকে বলে মিলিয়ারি টিউবারকিউলোসিস—দশ বছরের কম বয়সে অনেক সময় দেখা যায় এ ধরনের যক্ষ্মার আক্রমণ। অধুনা এই বয়সে কিছু কমেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে কিছু বেশি দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ম্যাজ-মেজে বা শরীর খারাপ ভাবটা বেশ বেশি, জ্বরও বেশি হয়। মস্তিষ্কের আবরক পর্দার এক্ষেত্রে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা—৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রদাহ হলে মাথাব্যথা, বমি, অস্থিরতা, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, আচ্ছন্নভাব ও কখনো বা খিঁচুনি হয়। আগে এ ধরণের সারা শরীরে যক্ষ্মা ছড়ালে রোগী মারা পড়ত। এখন সুচিকিৎসায় ৮০-৯০ শতাংশ ভাল হয়ে যায়।

চিকিৎসা—যক্ষ্মার বিরুদ্ধে রিফামপিসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ইথামবিউটল, আইসোনায়াজাইড, পাইরাজিনামাইড প্রভৃতি নানা কার্যকর ওষুধ বেরিয়েছে। রোগ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। চিকিৎসা করলে রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। তবে একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করতে হয়—৯-১৮ মাস। কোন কোন পদ্ধতিতে চিকিৎস করলে সময় আরও কম লাগে। একসঙ্গে তিন বা তার বেশি ধরণের

ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। সরকারী হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সার যক্ষ্মার ওষুধ সরবরাহ করা হয়। একবার চিকিৎসা আরম্ভ করলে টানা চালিয়া যাওয়া দরকার—চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**প্রতিরোধ**—বিসিজি টিকা সময়ে নিলে রোগ আক্রমণের ভয় থাকে না।

সংক্রামিত ব্যক্তি যারা—যাদের কফে যক্ষ্মার বীজাণু পাওয়া গেছে, তাদের থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেছে, শিশুরা যাদের ফুসফুস যক্ষ্মাক্রান্ত হয়েছে, তারা খুব কম ক্ষেত্রেই রোগটা ছড়ায়।

## ডিপথেরিয়া ( Diphtheria )

অসুখটি বীজাণু-ঘটিত। বীজাণুটির নাম কর্ণিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়ি। বীজাণু থেকে সংক্রমণের জায়গাতে এক ধরণের বিষ বের হয়। এই বিষের প্রভাবে মুখ্যতঃ রক্তসংবহন অচল হয়ে যায় এবং পক্ষাঘাত হয়। বংশধারা অনুসারে তিন ধরণের বীজাণু আছে—গ্রাভিস, ইনটারমিডিয়াস ও মিটিস। প্রথম দুটি বেশি ক্ষতিকারক। তৃতীয়টি বিষক্রিয়া হীন। তবে কখনো কখনো তৃতীয়টি বিষ উৎপাদন করতে পারে, আবার সময় বিশেষে প্রথম দুটি বিষ উৎপাদন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

### মহামারী সংক্রান্ত তথ্য

সারা পৃথিবীতে হয়, বেশি মহামারীর আকারে দেখা যায় হেমন্তে ও শীতে। অতি উন্নত দেশে টিকা চালু করার দরুণ রোগটা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। ৬ মাস বয়সের আগে ডিপথেরিয়া তেমন হয়না। তেমনি দেখা যায়না মধ্যবয়স পেরুলে। বেশি হয় ২—১০ বছর বয়সে। বর্তমানে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে—আগে স্কুল আরম্ভের পূর্বেই ছেলে মেয়েরা বেশি আক্রান্ত হত—এখন একটু বেশি বয়সে—যখন শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, তখন সব থেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে।

মুখ্যত সংক্রামিত রোগীর বা বাহকের নাক দিয়ে সর্দির সঙ্গে যে বীজাণু বের হয়—তার থেকেই সংক্রমণ ছড়ায়। রোগীই রোগ ছড়াবার সব থেকে বিপজ্জনক উৎস। নাকের ভিতরে অগ্রবর্তী অঞ্চলে ডিপথেরিয়া হলে যার হয় তার স্বাস্থ্যের তেমন ক্ষতি হয় না—তবে পুরু সর্দিসহ লক্ষ লক্ষ বীজাণু বেরোয় যা অত্যন্ত সংক্রামক। কাপড়-চোপড় বই বা খেলনার মাধ্যমে সংক্রমণ হতে যে পারে না তা'নয়, তবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বীজাণুগুলো তাপ, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। শুকোলেও বেঁচে থাকে। অতীতে কোন কোন সময় দুধের মাধ্যমে রোগবিস্তার হয়েছিল বলে জানা আছে।

রোগবিদ্যা

বীজাণুগুলি সংক্রমণের জায়গায় থেকেই বংশবৃদ্ধি করে। বহিঃবিষ বেরোয় বীজাণুর শরীর থেকে—শ্লৈষিকঝিল্লী পচে যায়। এর ফলে তথাকথিত একটি অস্বচ্ছ পর্দার মত সাদাটে আস্তরণ পড়ে। মুখের ভিতরে টাগরা এবং টনসিলের উপরে ও আশেপাশে গলার ভিতরের দিকে আস্তরণটা দেখা যায়। নাকের ভিতরের ঝিল্লীতে ও গলবিলেও দেখা যায়। তবে নাক, স্বরযন্ত্র বা গলবিলের থেকে বিষ বেশি মেশে মুখের ভিতরে গলার দিক থেকে। পর্দা ক্রমশঃ প্রসারিত হতে পারে শ্লেমনালী ও দুটি শ্বাসনালীর ভিতরে।

সংক্রমণের প্রথম সপ্তাহে যখন মৃত্যু হয়, হৃৎপিণ্ড তখন ফুলে ওঠে, ফ্যাকাসে হয়ে যায়, শোথগ্রস্ত হয়। কপাটিকাগুলি আক্রান্ত হয়না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত কোন কোন সময় দানা বাঁধতে পারে। প্রান্তীয় স্নায়ুর আবরক পর্দা মায়েসিন সিথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিডনীরও ক্ষতি হতে পারে, তবে তা অনির্দিষ্ট।

রোগলক্ষণ

সাধারণত সংক্রমণের ২—৫ দিনের মধ্যে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়টা ১—১০ দিনও হতে পারে।

টাগরার পাশে ও টাগরার উপরই বেশির ভাগ সময় সংক্রমণ দেখা যায়। ডিপথেরিয়ার বৈশিষ্ট্যমূলক পর্দা বা আস্তরণ দেখা যেতে পারে নাকের ভিতর, নাক ও গলবিলে, স্বরযন্ত্রে। অন্যান্য জায়গায় সংক্রমণের ঘটনা বিরল। কোন্ জায়গা আক্রান্ত হয়েছে, সেই অনুসারে সংক্রমণকে ভাগ করা হয়। যদিও বিভিন্ন অঞ্চল একই সময়ে আক্রান্ত হতে পারে।

**অগ্রবর্তী নাসিকা অঞ্চলের ডিপথেরিয়া** :—রোগলক্ষণ ধীরে প্রকাশ পায়। অল্পস্বল্প ম্যাজমেজে ভাব, জ্বর। নাকের ভিতরে অগ্রবর্তী অংশে পর্দা দেখা যায়। এক বা দু নাকে, সাধারণত নাকের মাঝখানে যে বিভাজক দেয়াল, তার দুপাশে। বিশিষ্ট লক্ষণ হল রক্তের সঙ্গে মেশা সর্দি ঝরছে, নাকের সামনের দিকে ক্ষত হয় যা উপরের ঠোঁট এবং আশেপাশে ছড়ায়। এ জায়গা থেকে খুব কম বিষই বিশোষিত হয়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহ বা পক্ষাঘাত তাই কদাচিৎ দেখা যায় এক্ষেত্রে। রোগ নির্ণয় না হলে কয়েক সপ্তাহ ধরে নাক থেকে এ ধরণের সর্দি ঝরতেই থাকে। চিকিৎসা আরম্ভ করলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। রোগীর পক্ষে এ ধরণের ডিপথেরিয়া মারাত্মক নয়, কিন্তু রোগ ছড়ানোর ব্যাপারে সাংঘাতিক ভূমিকা নেয়।

**পশ্চাৎবর্তী নাসিকা অঞ্চলের ডিপথেরিয়া** :—গলবিলের দিকে বিস্তার লাভ করে—এটা খুব সাংঘাতিক মারাত্মক রকমের ডিপথেরিয়া, এর সঙ্গে মুখের ভিতরের ডিপথেরিয়াও থাকতে পারে। টাগরার পিছনে পুরু পর্দা তৈরি হতে পারে। সহজে তাই দেখা যায় না, বিপদ তাই বেশি, রোগনির্ণয় করতে পারা যায় না। সাধারণ গলা পরীক্ষায় ধরা পড়ে না অনেক সময়।

**গলার ভিতরের চার পাশে ডিপথেরিয়া**—রোগ লক্ষণ ধীরে প্রকাশ পায়। শিশু কেমন শান্ত হয়ে আসে, খাবার গিলতে চায় না, দুর্বলতা, অল্প মাথাধরা, গা ম্যাজম্যাজ, গলায় ঘা হয়। মাঝারি জ্বর ১০১° F ( 38. 4°c ) এর বেশী সাধারণত ওঠেনা। কোন কোন সময় বাস্তবিকভাবে জ্বর থাকেই না প্রথম এক বা দুদিন।

প্রথমেই অস্বচ্ছ ধূসর সাদাটে পর্দাটা পড়েনা, কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনো কখনো পর্দা দেখা যায়না, গলার ভিতরের দু পাশ লাল হয়ে থাকে। তবে পর্দা দেখা যায় যখন, তখন একটা বা দুটো টনসিলের উপর এবং পরে তার উপরে আলজিভে ও টাগরায় ছড়ায়। পর্দাটা পাতলা হতে পারে বা মোটা হতে পারে। ধূসর বা হলদেটে রঙের, বা রক্ত মেশা থাকলে কালচে ধূসর রঙের। প্রথম অবস্থায় চকচক করে। সহজে সরানো যায়না, তুলো বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে ঘষলে, বা চাঁছলে রক্ত চুঁয়ে পড়ে। বিশিষ্ট একটা দুর্গন্ধ থাকে। গলার গ্রন্থিগুলির প্রদাহ হয়, তবে ব্যথা হয়না তেমন। চাপ দিলে ব্যথা লাগে সামান্য। পরে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্তমাখা সর্দি বেরোয়। আছন্ন ভাব, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, বমি ও দ্রুতগতি নাড়ী—বিষক্রিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ।

পর্দা কতখানি পড়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই ধরনের ডিপথেরিয়া কতটা মারাত্মক। এজন্যে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে (ক) মৃদু—টনসিলের ডিপথেরিয়া—একটি বা দুটি টনসিল আক্রান্ত হয়।

(খ) মধ্যম—পর্দা ছড়িয়ে যায় উপরের দিকে, আলজিভ বা গল নালীতে, গলার চারপাশের গ্রন্থিগুলির মাঝারি ধরনের প্রদাহ হয়।

(গ) সাংঘাতিক—পর্দা আগের মত, কিন্তু টনসিল প্রভৃতি দারুন ফুলে ওঠে, গলার চারপাশের গ্রন্থিগুলির দারুন প্রদাহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ার ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তপাত হয়।

**মারাত্মক ডিপথেরিয়া**—পূর্বোক্ত সাংঘাতিক ডিপথেরিয়ায় মৃত্যুর হার খুব বেশি। রোগী এক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটি শিশু—ছটফট করছে, উত্তেজিত, ফ্যাকাসে। মুখ হাঁ করে খোলা, ফোলা, গলার চারপাশের গ্রন্থির দারুণ প্রদাহের জন্যে ষাঁড়ের মত গলা (bull neck), বারবার বমি, খাওয়ানো কষ্টকর। প্রস্রাবের সঙ্গে দারুণ ভাবে অ্যাল-বুমিন বেরিয়ে আসে। নাড়ীর গতি দ্রুত, রক্ত চাপ কম। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুততর, কষ্টকর, উপর উপর নীলচে ভাব আসে ফ্যাকাসের

জায়গায়। নাক থেকে গড়ায় রক্তমেশা সর্দি। চামড়ার নিচে পিনের মাথার মত রক্ত জমে, বিশেষ করে বগলে ও বুকের সামনের দিকে, মুখের ভিতরেও রক্তপাত দেখা যেতে পারে। এগুলো সবই খারাপ লক্ষণ। গলা দারুণ ভাবে ফুলে থাকে, বদ গন্ধটা বড় বিশিষ্ট, চিনতে ভুল হয় না। হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে ৫—২১ দিনের মধ্যে কিন্তু অনেক পরেও হতে পারে, হঠাৎ নিদারুণ শ্রান্তিতে। যারা বেশিদিন বাঁচে তাদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় ব্যাপক পক্ষাঘাত।

**স্বরনালীর ডিপথেরিয়া**—পাঁচ বছর বয়সের উপরে এটা বিরল। এধরণের ডিপথেরিয়া হলে স্বরতন্ত্রে বাধার সৃষ্টি হয়, তুলনামূলকভাবে বিষক্রিয়া অবশ্য কম থাকে। পর্দা ক্লোমনালী হয়ে বড়বড় শ্বাসনালীতে ছড়ায়। লক্ষণ—খ্যানখেনে গলা, কাশি, শ্বাস টানতে ঘরঘর শব্দ, অসুবিধা। ছটফটানি বাড়ে, ফ্যাকাসে হয়ে যায়, পরে নীলাভ দেহ, শ্বাসকষ্ট। ২৪ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যে এটা হতে পারে। এর সঙ্গে যোগ হতে পারে মাঝে মাঝে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ, যার ফলে বিষমভাবে বাধার সৃষ্টি হয় শ্বাসপথে, মৃত্যু ডেকে আনে। রোগের প্রথম দিকেই বিরল ক্ষেত্রে কাশির দমকে পর্দা বেরিয়ে আসে, রোগী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

**অন্য জায়গার ডিপথেরিয়া**—চামড়ার ডিপথেরিয়া বিরল। চোখে, কানে, নবজাতকের নাভিতে এবং জননাঙ্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ডিপথেরিয়া হতে পারে—এসবও বিরল ঘটনা। কান থেকে বহুদিন রস গড়াচ্ছে—এমন রস থেকেও গবেষনাগারে ডিপথেরিয়ার বীজানু পাওয়া গেছে।

### জটিলতা

প্রান্তিক রক্ত সংবহনতন্ত্র অচল হয়ে যায়—সাংঘাতিক হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহ—ফলে মৃত্যু। যারা বেঁচে যায়, তাঁদের হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহও কিন্তু সেরে যায় সম্পূর্ণভাবে।

পক্ষাঘাতের প্রথম বলি হয় টাগরা, ৭ দিনের দিন হতে পারে। তবে তৃতীয় ও ষষ্ঠ সপ্তাহের মধ্যেও হতে পারে। চোখেরও পক্ষাঘাত হতে পারে, দেখতেও অসুবিধা হতে পারে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রান্তিক স্নায়ুপ্রদাহ হতে পারে। সাধারণত অনুভূতি থাকে না। এদের ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তবে ৬ সপ্তাহের আগে সাধারণত হয় না। মধ্যচ্ছদার ( diaphram ) পক্ষাঘাতের জন্যে, গলবিলের পক্ষাঘাতের জন্যে কিংবা বুকের মাংসপেশীর পক্ষাঘাতের জন্যে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হতে পারে।

অ্যালবুমিনিউরিয়া হতে পারে, ব্রনকাইটিস, ব্রনকোনিউমোনিয়া হতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

গলা নাকের সোয়ব (swab) নিয়ে পরীক্ষা করলে গবেষণাগারে বীজাণু পাওয়া যেতে পারে। বৈশিষ্ট্য মূলক পর্দা যা ওঠাতে গেলে ঠিক ওঠানো যাবেনা ; রক্তক্ষরণ হবে। প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে সীক টেস্ট ( schick test )-এর মাধ্যমে।

## চিকিৎসা

রোগীকে বিছানায় আলাদা রাখতে হবে অন্তত কম করেও তিন সপ্তাহ। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহের লক্ষণ সমূহ দেখা দিলে আরও বেশিদিন বিছানায় রাখতে হবে।

পরপর তিনবার নাক ও কানের সোয়াব পরীক্ষা করিয়ে যদি বীজাণু না পাওয়া যায়, তখন রোগীকে ছাড়া যেতে পারে।

নির্দিষ্ট ওষুধ হল ডিপথেরেটিক অ্যান্টিটকসিন ২০০০০ ইউনিট— ২০০,০০০ ইউনিট পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে অর্ধেক বা পুরোটাই শিরার ভিতর।

## প্রতিকার

কার্যকর টিকা ট্রিপল ভ্যাকসিন বা ট্রিপল অ্যান্টিজেন যার বিষয়ে

আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

## হুপিংকাশি (Whooping cough, pertussis)

হুপিংকাশি ক্লোমনালী ও শ্বাসনালীর (tracheo bronchial) এক বিষম সংক্রামক অসুখ, যা কাশির বিশিষ্ট ধরণ ও অন্যান্য রোগলক্ষণ থেকে চেনা যায়, হয় সাধারণতঃ ছোট শিশুদের—যারা ডিপথেরিয়া, টিটেনাস ও হুপিংকফের টিকা নেয়নি।

### কারণ

যে বীজাণুর জন্য এই সংক্রমণ—তার নাম বর্ডেটেলা পারটুসিস—এটি গ্রাম নেগেটিভ ককোব্যাসিলাস—এর আবার কতকগুলো বংশ আছে। যার মধ্যে স্তর i বংশ (Phase 1 strain) ক্ষতিকারক (স্তর i—স্তর iv আবিষ্কৃত হয়েছে)।

### মহামারী সংক্রান্ত তথ্য

একমাত্র মানুষই হুপিংকাশির বীজাণুর আশ্রয় দাতা। অন্য কোন প্রাণী থেকে এ রোগ সংক্রামিত হয় না। সংক্রামিত ব্যক্তির শ্বাসনালী থেকে যে তরল পদার্থ বের হয়, তাতেই বীজাণু থাকে, তার থেকেই সংক্রমণ ছড়ায়। শীতের শেষে এবং বসন্তের প্রারম্ভে এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

যে জনসমাজে শিশুদের মধ্যে হুপিংকাশির টিকা চালু নেই, সেখানে তারা হুপিংকাশিতে বেশি আক্রান্ত হয়। নবজাতক ও ছোট শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি, এর কারণ গর্ভবতী মায়েদের রক্তে সাধারণত হুপিংকাশির অ্যান্টিবডি থাকে না; তাই নবজাতককে রক্ষা করতে পারে না। ১৯৪০ এর দশকে টিকা আবিষ্কারের পর উন্নত দেশগুলিতে হুপিংকাশি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও ঐ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষনীয় ভাবে কমে গেছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ ভাবে হুপিংকাশির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হলে হুপিংকাশি কমে যাবে।

রোগবিদ্যা

বীজাণুগুলি ক্লোমনালী (trachea) ও শ্বাসনালীর (bronchus) রোমযুক্ত আচ্ছাদক কলায় আটকে থাকে আঠালো সর্দির সঙ্গে। শ্বাসনালীর নিউমোনিয়াও হতে পারে, কিন্তু ফুসফুসের ছোট, থলিগুলি ( আ্যালভিওলাই ) সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় না। রক্তে শ্বেতকণিকার ভিতর লিম্ফোসাইট বেশি পাওয়া যায়। বীজাণু তার দেহকোষের ভিতর থেকে বিষ তৈরী করে—যা আঘাত হানে, হিস্টামিন ও সেরোটানিন বেশি বেরোয়, অভিঘাতও হতে পারে, বিটা অ্যাড্রেনার্জিক পথ অবরুদ্ধ হয়।

রোগলক্ষণ

রোগ সংক্রমণ থেকে রোগলক্ষণ প্রকাশের অন্তর্বর্তীকাল ১০—১৬ দিন। হুপিংকাশির তিনটি স্তর—প্রতিটি স্তর মোটামুটি ২সপ্তাহ স্থায়ী হয়।

(১) সর্দির স্তর—(catarrhal stage) এই স্তরের লক্ষণ ও চিহ্নগুলি দেখে মনে হয়, শ্বাসযন্ত্রের উপরের অংশে কোন ধরণের সংক্রমণ হয়েছে। অনেকটা সাধারণ সর্দির মত লক্ষণ। ঘন ঘন হাঁচি, রাত্রে কাশি, চোখের কোণ লাল হয়ে যায়, সামান্য জ্বর থাকতে পারে। এই স্তরেই, রোগের আত্মপ্রকাশের প্রথম দিকেই এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ শিশুতে সংক্রমণ ছড়ায় বেশি।

(২) প্রবল স্তর (Paroxysmal stage)—কাশি বাড়ে, দিনেও হয় প্রবল দমকে। দমফাটা ঘুংড়ি কাশির সৃষ্টি হয় জোর করে গভীর শ্বাসগ্রহণ করার জন্য যার ফলে কাশির দমক বাড়ে। কাশির প্রাবল্যের জন্য শিরার উপর চাপ বাড়ে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, চোখের চারপাশ ফুলে ওঠে, চোখের কোণে রক্তপাত হতে পারে। কাশির দমকের পর বমি হতে পারে। এই স্তরে সাধারণত জ্বর থাকেনা, যখন জ্বর থাকে, বুঝতে হবে অন্য কোন বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ ঘটেছে।

(৩) রোগমুক্তির স্তর (convalesent stage)—লক্ষণগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে। তাহলেও এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, বিষমস্তর পার হয়ে যাবার অনেক মাস পরেও উপরের শ্বাসযন্ত্রের সামান্য অন্য কোন ধরণের সংক্রমণের ফলে আবার ঐ বিশিষ্ট প্রবল কাশির দমক আরম্ভ হতে পারে।

খুব ছোট শিশুর বেলায় হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়, শিশু শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না। অক্সিজেনের অভাব হয়।

## জটিলতা

হুপিংকাশি বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে, কারণ অন্য বীজাণু ও ভাইরাসের গৌণ সংক্রমণ, আর ঐ ধরনের সংক্রমণই সাধারণত হুপিংকাশিতে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। অকসিজেনের অভাব, খাবারের অভাব ও বমির জন্য শরীরে অম্ল ও ক্ষারের সমতার অভাব হয়। মস্তিস্কের কর্টেকস-এর ক্ষতি হতে পারে—তবে এটি খুব কমক্ষেত্রেই দেখা যায়, কারণও এর অজানা।

মস্তিকে রক্তক্ষরণ হতে পারে—তবে রক্তের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে নাক থেকে রক্তপাতের ঘটনাই বেশি। গলা ও বুকের উপরে চামড়ার নিচেও জমাট বাঁধা রক্ত দেখা যেতে পারে ( চোখের কোণে রক্তপাত হতে পারে )। রেটিনা স্থানচ্যুত হতে পারে, কাশির সঙ্গে রক্ত ঝরতে পারে। কান দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। হার্নিয়া হতে পারে, পায়খানার দ্বার ঝুলে বেরিয়ে আসতে পারে ( prolapse )।

বারবার বমি হতে পারে। ফলে অপুষ্টি, শরীরে জলের ঘাটতি।

ফুসফুসের জটিলতা ব্রঙ্কানিউমোনিয়া, রোগের যে কোন স্তরে এমফাইসেমা হতে পারে।

খিচুনি হতে পারে—বিশেষতঃ যে সব শিশুর বয়স ছ মাসের নিচে—এর ফলে রোগী মারাও যায়। খিচুনি বারবার হতে থাকলে

মৃত্যুসম্ভাবনা বাড়ে। সাংঘাতিক সংক্রমণ হলে বারবার খিঁচুনি দেখা দেয়।

## রোগ নির্ণয়

রোগ লক্ষণ দেখে, বিশেষ করে অসুখের প্রবল স্তরে রোগ বোঝা যায়। রক্তে শ্বেত কণিকা বাড়ে, তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায় লিম্ফোসাইট (৭৫% বা তারও বেশি)! কাজেই নিউট্রোফিলের শতাংশ যদি বেশি থাকে, তাহলে অন্য কোন বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ সম্ভাবনা থাকে।

অসুখের প্রথম স্তরে নাকের ভিতর থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা করলে বি• পার্টুসিস বীজাণু পাওয়া যেতে পারে।

## চিকিৎসা

হুপিংকাশির চিকিৎসায় বীজঘ্ন কোন ওষুধ ফলদায়ী কী না, প্রশ্ন তোলা হয়েছে। হুপিংকাশিতে আক্রান্ত হলে বীজঘ্ন কোন ওষুধ প্রয়োগে হুপিংকাশির বীজাণু বিদূরিত হলেও রোগের কাল এবং ভোগান্তির তেমন কোন ইতরবিশেষ হয় না বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাহলেও রোগীকে বীজঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করে বীজাণুমুক্ত করা উচিত—তাতে রোগলক্ষণের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও চিকিৎসক লাভবান হবেন।

ইরাইথ্রোমাইসিন ফলপ্রদ। শিশুর পক্ষে এটাই ভাল। টেট্রাসাইক্লিনও কার্যকর—তবে শিশুর বেলায় ওষুধটি দিলে দাঁতে ছোপ পড়ে।

১০—১৪ দিন বীজঘ্ন ওষুধ দিতে হবে।

রোগলক্ষণ অনুযায়ী সময়মত অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন—

(১) অক্সিজেনের অভাব হলে অক্সিজেন দিতে হবে

(২) পুষ্টি যাতে ব্যাহত না হয়, দেখতে হবে

(৩) দেহের অম্ল ও ক্ষারের সমতা যাতে থাকে, তার দিকে নজর দিতে হবে।

(৪) কাশি কমাবার ওষুধ দেওয়া যেতে পারে

(৫) ছোট শিশুদের বেলায় কাশিতে শ্বাসযন্ত্রের পথ আটকে যেতে পারে—দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তাই ছোট শিশুদের পরিচর্ষা সাবধানে করতে হবে, মাথা একটু নিচের দিকে রাখতে হবে।

### প্রতিরোধ

এখন টিকা বেরিয়েছে। তৈরি করা হয় মৃতস্তর I বি. পার্টু'সিস বীজাণু থেকে।

যেহেতু খুব ছোট শিশুদের সংক্রমণপ্রবণতা বেশি, প্রথম টিকা নিতে হবে ( ইনজেকশনের আকারে ) ১২ সপ্তাহ যখন শিশুর বয়স, সেই সময়ে। এক মাস অন্তর তিনটি ইঞ্জেকসন দিতে হয়, বুষ্টার মাত্রা দিতে হবে সাধারণতঃ ২ বছর বয়সে ( এক বছর, তিন বছর ও পাঁচ বছর বয়সের পরে ) সাধারণত ডিপথেরিয়া, টিটেনাস ও হুপিংকাশি তিনটে মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে টিকা তৈরি হয় ( ট্রিপল এ্যান্টিজেন )।

টিকা দিলে শিশুর ক্ষতি হয় কি? জ্বর ছাড়া অন্য ক্ষতি বড় একটা দেখা যায় না। খুব কম ক্ষেত্রে শিশুর তড়কা হতে পারে, তবে এসবের বেলায় আগেই শিশুর তড়কার ইতিহাস থাকে। প্রথম মাত্রা নেবার পর যদি কোন সাময়িক লক্ষণ দেখা যায় তাহলেও আর পরবর্তী মাত্রাগুলো দেওয়া উচিত নয়। এরকম ইতিহাস থাকলে টিকা দেওয়া উচিত নয়। টিকা দেওয়ার ফলে মস্তিষ্কের প্রদাহ হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক কম। এটা নিশ্চিত যে টিকা নিলে হুপিংকাশি থেকে শিশুদের মৃত্যু ও রোগাক্রান্ত হবার ভয় থাকে না। টিকাজনিত ক্ষতির খতিয়ান এর তুলনায় অতি নগণ্য।

ছ'বছর বয়সের উপরের শিশুদের টিকা নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কারণ ঐ বয়সের উপরে বা প্রাপ্তবয়স্করা টিকা নিলে চামড়ায় স্থানীয়

গোলযোগ দেখা দিতে পারে বা শরীরের অন্য যান্ত্রিক গোলযোগ সাংঘাতিকভাবে দেখা দিতে পারে।

হুপিংকাশির টিকার প্রতিষেধক ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে আসে। তাই, আগে থেকে টিকা দেওয়া আছে, এমন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি—যাঁরা হুপিংকাশির রোগী নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা কিন্তু প্রতিষেধক হিসাবে হুপিংকাশির টিকা নিয়মিত ব্যবধানে নিতে পারেন। আগে টিকা নেওয়া না থাকলে রোগীর সঙ্গে মেলামেশার সময় রাসায়নিক প্রতিষেধক হিসাবে ইরাইথ্রোমাইসিন বা টেট্রাসাইক্লিন খাওয়া যেতে পারে—সাময়িকভাবে যদিও এটা কতটা কার্যকর, তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যথেষ্ট প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের গামা গ্লোবিউলিন (hyper immune gamma globulin) ইনজেকসন করেও রোগীর চিকিৎসা করা যায় বা ঐ ধরণের গামা গ্লোবিউলিন প্রতিষেধক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে হুপিংকাশির আক্রমণ হতে পারে না, অথবা হলেও রোগলক্ষণ নামমাত্র হয়, সহজেই রোগী সেরে ওঠে।

কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সময় মত শিশুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া।

আরোগ্য সম্ভাবনা:

পাঁচ বছরের উপরের শিশু আক্রান্ত হলে মৃত্যু তেমন একটা দেখা যায় না। এক বছর বয়সে অসুখ হলে মৃত্যুর হার দশ শতাংশের মত। আরোগ্য লাভের পর যে সব জটিলতা—যেমন ব্রনকিয়েকটাসিস, পক্ষাঘাত, খিচুনি, জড়বুদ্ধি, অন্ধত্ব—এসব এখন আর তেমন দেখা যায় না।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)

একটি বীজাণুর সংক্রমণে এই রোগ হয়। বীজাণুটির নাম

ক্লসট্রাইডিয়াম টিটানি। সংক্রমণ হলে মাংস পেশী টানটান শক্ত হয়ে যায়, তার উপর মাঝে মাঝে খিচুনি দেখা দেয়। বিশিষ্টতা হল মুখের মাংস পেশী ম্যাসিটার এবং দেহের মাংসপেশী আক্রান্ত হয়।

**মহামারী সংক্রান্ত তথ্য ঃ**

খুবই ছোট এ বীজাণু—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না নিলে দেখা যায় না খালি চোখে। দেখতে অনেকটা ড্রাম বাজানো কাঠির মত। বীজাণুগুলো বেশ খানিকটা তাপ সহ্য করতে পারে আর দেহের কোষে মাসের পর মাস চুপ চাপ বসে সময় ও সুযোগ খুঁজতে থাকে বংশবৃদ্ধিও বিষ নিঃসরণ করার। জীবজন্তুর মলে যেমন ঘোড়ার নাদ এমনকি মানুষের বিষ্ঠাতেও এই বীজাণু পাওয়া যায়। ধূলায় এবং মাটিতে, বিশেষত সার ব্যবহার করা হয়েছে এমন জমিতে এরা ছড়িয়ে থাকে।

কেটে ছড়ে গেলে ধনুষ্টঙ্কার হবার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি গোলাপের কাঁটা ফুটেছে, অথবা ফুলের কাঁটা বা মাছের কাঁটা বা বা ভাঙাকাঁচ বা পেরেক ফুটেছে পায়ে বা হাতে, এসব ক্ষেত্রে ঐ ছোট রন্ধ্রপথ দিয়ে বীজাণু শরীরে ঢুকে বংশবৃদ্ধি করার সুবিধা সুযোগ পায়। সেফটিপিন বা আলপিনে দাঁত খুঁচলে বা কান খোঁচালেও এমনটা হতে পারে। উপর উপর কেটে যাওয়ার থেকে শরীরের ভিতর যখন বীজাণু যায় তখন তাদের বৃদ্ধির সুবিধা। কোষ সমূহ পচতে থাকলে এদের বেড়ে ওঠার সুবিধা—কাজেই যখন কাপড়চোপড় বা ঐ ধরণের নোংরা কিছু ক্ষতকে দূষিত করে, তখন টিটেনাস হবার সম্ভাবনা বেশি।

হাসপাতালেও সংক্রমণ হতে পারে—যখন কোন শল্যচিকিৎসার বা অস্ত্রোপচারের জিনিস যেমন তুলোর কুচি, গজ, সেলাইয়ের সূতা প্রভৃতি এই বীজাণু দিয়ে দূষিত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বভাবতই এই রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

কোন গভীর ক্ষত যদি মাটি দ্বারা দূষিত হয়, কোন ঘা, দেহের উপর কোন পচাগলা কোষ—দেহের কোন অংশ পুড়ে গেলে—এসব ক্ষেত্রে টিটেনাস রোগ সংক্রমণ তাড়াতাড়ি হতে পারে। এরকম কোন ক্ষত দেহে থাকলে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করেন, কাটাকুটির সম্ভবনা যেখানে বেশি, সেখানেও এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি।

শিশু জন্মের পরই নাড়ি কাটার সময় সংক্রমণ হতে পারে। আগে তো গোবর প্রভৃতি দেওয়া হত কাটানাড়ির উপর। ফল হত সাংঘাতিক। এখনও নানা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে যথেষ্ট সতর্কতা না নিয়ে নাড়ি কাটা হয়। একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রতি বছর আমাদের দেশে জন্মের পরেই টিটেনাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আড়াই লক্ষ শিশু।

রোগ বিস্তা

চামড়ার ভিতর দিয়েই টিটেনাসের বীজাণু শরীরে ঢোকে, যদিও ক্ষতটা এত ছোট হতে পারে যে দেখা বা চেনা নাও যেতে পারে। কেউ কেউ শ্বাসনালী (trachea) বা অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ভেদ করে সংক্রমণের কথাও বলেছেন। পুঁজ তৈরী করতে পারে এমন বীজাণুর উপস্থিতিতে টিটেনাস হবার ঝুঁকি বেশি, কারণ এর ফলে কলার ক্ষতি বেশী হয়, টিটেনাস বীজাণু বংশবৃদ্ধি করবার সুবিধা পায়।

এই বীজাণুর শরীর থেকে বেরোয় বহিঃবিষ (exotoxin) যা স্নায়ু কলাকে আক্রমণ করে। প্রান্তিক স্নায়ু থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বিষ বাহির হয়। রক্তেও বিষ ছড়ায়।

স্নায়ুকোষে বিষ যখন সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন অ্যান্টিটকসিন দিয়ে তাকে অকেজো করা যায় না। টানটান শক্ত যে ভাব সেটা স্নায়ু যেখানে মাংপেশীতে এসে শেষ হয়েছে, তার উপর বিষের ক্রিয়ার ফল। আর প্রতিবর্তী খিচুনীর জন্যে দায়ী হল শিরদাঁড়ার স্নায়ুর রজ্জুর উপর বিষের প্রতিক্রিয়া।

শরীরের কোন যন্ত্রে বা তন্ত্রে বিশিষ্ট কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। গৌণ ফলশ্রুতি হল নিউমোনিয়া, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহ এবং কশেরুকার চিড় ধরা ( vertebral fractures )।

**রোগ লক্ষণ**

শরীরে বীজাণু ঢোকার পর লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৩—২১ দিন সময় লাগে। কোন কোন সময় ১০০ দিনও লাগতে পারে। সংক্রমনের পর রোগ লক্ষণ যদি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায় তাহলে ধরে নিতে হবে রোগ খুবই গুরুতর আকার ধারণ করবে এবং এক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেশি। সংক্রমণের পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে যত দেরি হবে ততই রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে।

এই রোগে আক্রান্ত হলে জ্বর সাধারণত হয় না, জ্বর হলেও ৯৯°F (৩৭·৩°C) এর মত। তিনটি স্তর। (ক) প্রাথমিক স্তরে পেটের দিকে ব্যথা, যা ঘুরে বেড়ায় এবং একটা অনুভূতি, যাতে মনে হয় সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। মাংসপেশীর আক্ষেপ বা সঙ্কোচনও দেখা যায়। ঢোক গিলতে অসুবিধা হতে পারে—যা রোগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। (খ) পরের স্তরে পেশী টানটান ও শক্ত হয়ে যায়। চোয়ালের মাংসপেশীর যন্ত্রণাহীন আক্ষেপ—মাংসপেশীর টানটান শক্ত হবার প্রথম উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়—এটা প্রথম রোগলক্ষণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে চোয়াল সামান্য শক্ত হয়—ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকে—হাঁ করার অসুবিধা—দাঁতে দাঁত টিপে থাকে—মুখ খোলাতেই পারা যায় না—বিকৃত হয়ে যায় মুখের ভাব—যেন ভেংচি কাটছে—অনেকটা এইরকম। পেটের মাংসপেশীও শক্ত হয়ে যায়। মাংসপেশীর টান ভাবটা যত বাড়তে থাকে, মাথা বেঁকে যায়। পিছন দিকে দেহ ধনুকের মত বেঁকে যায়—তাই বলে ধনুষ্টঙ্কার। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই টান-ভাব প্রকট হয় গুরুতর অসুখে। সমস্ত গতি শ্লথ হয়, কষ্টকর হয় কোন কিছু গেলা, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে—বুকে কঠিন চাপ পড়ার মত

ভাব হয়। বদলে যায় গলার স্বর। এরপর (গ) তৃতীয় স্তরে শুরু হয় খিঁচুনি। রোগ গুরুতর আকার ধারণ না করলে এটা হয় না। আপনা আপনিই খিঁচুনি আসতে পারে বা কোনরকম শব্দ হলেও রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হতে পারে—প্রথম প্রথম বিলম্বিত লয়ে, তারপর ঘনঘন খিঁচুনি হতে থাকে। কোন কোন সময় প্রথমবারের খিঁচুনিটাই মারাত্মক হয়, এবং এতেই রোগী মারাও পড়ে। দু'তিন সপ্তাহ বা তারও বেশি পর্যায়ক্রমে খিঁচুনি হতে পারে—খুবই যন্ত্রণাদায়ক—রোগী খুব ভয় পায় একে। তার জ্ঞান কিন্তু লোপ পায় না। খিঁচুনির চোটে বন্ধ হতে পারে শ্বাসপ্রশ্বাস।

রোগ গুরুতর হলে মৃত্যু হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে। রোগী বাঁচলে পেশীটান তিনমাস পর্যন্ত থাকতে পারে। রোগের প্রকোপ মাঝারি ধরেনের হলে খিঁচুনি ৭—১০ দিন থাকে, পরে পেশীর টান ভাবটাও আস্তে আস্তে কমে আসে। এর ৬ সপ্তাহ পরে রোগী সেরে যায়। সারার পর এ রোগের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

নবজাতক জন্মাবার ৭ দিনের মধ্যে তার এ রোগ হলে বাঁচার সম্ভাবনা কম। ছেলে মেয়ে ও বড়দের বেলায় রোগ সংক্রমণের কত দিন পর রোগলক্ষণ দেখা দিয়েছে, কী পথে রোগটা অগ্রসর হচ্ছে এবং কীরকম চিকিৎসা হচ্ছে, এসবের উপর বাঁচামরা নির্ভরশীল। এখন পেশী শিথিল করার ওষুধ আছে, কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো যায়, এসব ব্যবস্থা নেবার জন্যে এ রোগে মৃত্যুহার আগের থেকে অনেক কমে গেছে। রোগ শুরু হবার পর ৩।৪ দিন যদি কেটে যায় এবং যথাবিধি চিকিৎসা করা যায়, তাহলে ভাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি।

### জটিলতা

গুরুত্বপূর্ণ হল শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত জটিলতা। বেশির ভাগ রোগী মারা যায় দমবন্ধ হয়ে বা শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে বাধাপড়ার জন্য ঠিকমত না কাশতে পারার বা না ঢোক গিলতে পারার ফলে গৌণ ভাবে।

নিউমোনিয়া সংক্রমণে মৃত্যু হতে পারে। প্রস্রাব আটকে যায়, অনেক সময় দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। সাংঘাতিক আক্ষেপের ফলে জিভ ক্ষতবিক্ষত হতে পারে বা চাপে পড়ে কশেরুকায় চিড় ধরতে পারে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহ হতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

চোয়াল শক্ত হওয়া ও চোয়ালের মাংসপেশীর বেদনাহীন আক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে পেটের বেদনাহীন টানটাভব—জ্বর হচ্ছে না এমন রোগীর বেলায় এই দুটো লক্ষণ টিটেনাস চিনিয়ে দিতে পারে। গলা ও পিঠও শক্ত হয়ে যায়—অথচ মেনিনজাইটিসের মত মাথাব্যথা, বমি, জ্বর এসব থাকেনা। মাংসপেশীর টান ভাবটা সব সময় থাকে, কখনোই শিথিল হয় না, রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত।

## চিকিৎসা

রোগীর সেবা করতে হবে একটা অন্ধকার ঘরে রেখে, কোন গোলমাল, শব্দ যেন না ঢোকে। যতক্ষণ সম্ভব মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে, নইলে নাকের ভিতর নল পুরে খাওয়ানো চলতে পারে যদি গিলবার অসুবিধা দেখা দেয়। যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার দরকার। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে নল (ক্যাথিটার) দিয়ে প্রস্রাব করাতে হবে।

অনেক ধরনের ওষুধ এখন পাওয়া যায় যা দিয়ে মাংসপেশীর টান ভাবটা কমানো যায়। সাংঘাতিক খিঁচুনি প্রতিহত করতেও কোন কোন ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে।

যান্ত্রিকভাবে যাতে দরকার হলে অক্সিজেন দেওয়া যায়, সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

নির্দিষ্ট চিকিৎসা হল অ্যান্টিটিট্যানিক সিরাম (এ টি এস) ৫০,০০০-১০০,০০০ ইউনিট আধ বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে। পেনিসিলিন ও অন্যান্য ওষুধও দেওয়া হয়।

### প্রতিরোধ

রোগ হলে তার চিকিৎসা করার চেয়ে যাতে রোগ না হয়, তারই ব্যবস্থা করা দরকার। ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধ করা যায়। পোয়াতীকে টিটেনাস টকসয়েড দিলে প্রসবকালে তাঁর যেমন ধনুষ্টঙ্কার হবার ভয় থাকেনা, সেই রকম নবজাতক জন্মাবার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে তারও ঐ রোগ হবার সম্ভাবনা কম। গাঁয়ে এখনো অনেক জায়গায় ধাই দিয়ে প্রসব করানো হয় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে। শিক্ষার প্রসার চাই—চাই প্রসূতীর প্রসবকালীন নিরাপত্তা।

ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের জন্য এখন সব দেশেই শিশুদের ৩ মাস বয়সে ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া হয়—প্রথম ডোজ, তারপর ৪ মাস বয়সে একবার এবং ৫ মাস বয়সে আর একবার। ২—৩ বছরে একবার এবং ৫ বছরে স্কুলে যাবার সময় আর একবার ট্রিপল অ্যান্টিজেনের বুষ্টার ডোজ দেওয়ার নিয়ম। হুপিংকফ ও ডিপথেরিয়াও প্রতিরোধ করা যায় এতে। বড়দের বা গর্ভবতীদেরও টিটেনাস টকসয়েড দিলে এই রোগ হবার সম্ভাবনা থাকেনা। প্রথম মাত্রা ১ মিলিলিটার, দেড়মাস পর ১ মিলিলিটার—তার ৬ মাস পর আর একবার ১ মিলিলিটার। বড় রকম কেটে ছড়ে গেলে, কোন ব্যক্তির ৫ বছর আগে টিটেনাস টকসয়েড নেওয়া থাকলে আর একটা বুষ্টার ডোজ দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে ১৫০০ মিলিলিটার এ টি এস সিরাম।

## পলিওমায়েলাইটিস (Poliomyelitis)

পলিওমায়েলাইটিস ভাইরাস ঘটিত একটি বিষম অসুখ। তিন ধরনের পলিওভাইরাস আছে, এদের কোন একটি থেকে পলিওনায়েলাইটিস হয়। পলিওভাইরাস তিনটি এনটেরোভাইরাস শ্রেনীর অন্তর্গত ছোট আর এন এ ভাইরাস। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কম, কিন্তু অনেকের হয় পক্ষাঘাত, ফলে সারা জীবনের জন্যে প্রতিবন্ধী।

### মহামারী সংক্রান্ত তথ্য

রোগলক্ষণ প্রকাশের আগে গলবিল ও নাকের সর্দির মধ্যে পলিও-

মায়েলাইটিসের ভাইরাস পাওয়া গেছে। এটা জানা ছিল ১৯১১ সাল থেকে, তাই মনে করা হত, সংক্রমনের পথ শ্বাসতন্ত্রের ভিতর দিয়েই। ত্রিশ শতকের শেষের দিকে অবশ্য শুধু মলেই নয়, নর্দমার জলেও পোলিও ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে; তাই বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকই বলেন যে এটা মুখের ভিতর দিয়ে অন্ত্রে যায় এবং রোগ সৃষ্টি করে। অতি সম্প্রতি আবার কেউ কেউ শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে রোগটা বাহিত হয় বলে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাছি, আরশোলা প্রভৃতি গবেষণাগারে এই ভাইরাস দিয়ে খাবার দূষিত করতে পারে, তবে প্রকৃতিতে এর কোন গুরুত্ব আছে কিনা, এরা রোগ ছড়ায় কিনা এ নিয়ে সন্দেহ আছে।

মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু পোষক হিসাবে কাজ করে বলে জানা যায়নি, মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায়।

১৮৪০ সাল থেকে রোগটার সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা—টিকা বেরিয়েছে ১৯৫৫ সালে। উন্নত সব দেশেই টিকা দেওয়া হয়, সে সব জায়গায় রোগটা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। উন্নয়নশীল বেশির ভাগ দেশেই পলিওমায়েলাইটিস সংক্রমণের পর পক্ষাঘাত একটা জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

রোগলক্ষণ দেখা দেবার তিনদিন আগে থেকে ১৪ দিন পর পর্যন্ত রোগী সংক্রমণ ছড়াতে পারে যদি অবশ্য তার জ্বর না থাকে। (ভাইরাস) শুকনো মলের মধ্যে থাকে বলে ধুলোর সঙ্গে নাকের ভিতর দিয়ে শরীরে ঢুকতে পারে—খানা ডোবা দূষিত করতে পারে—ঐ ধরনের খানা ডোবায় স্নান করলে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে।

### রোগবিদ্যা

অন্ত্র ও মুখ-গলবিলের সংলগ্ন লসিকাতন্ত্রে ভাইরাসগুলো সংখ্যায় বাড়ে—সেখান থেকে রক্তে যায়, তারপর তারা আক্রমণ করে কশেরুকার স্নায়ুকোষকে। এই স্নায়ুকোষ চালক স্নায়ুকোষ। ক্ষতিগ্রস্ত হলে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। সাংঘাতিক সংক্রমণে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হতে পারে, রোগীর মৃত্যু হয়।

### রোগলক্ষণ

ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর থেকে রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে ৬—২০ দিন। যাদের শরীরে ঢোকে, তাদের সবাই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয় না। বেশিরভাগের বেলায় অনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন মাঝারি রকম মাথাধরা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্দিভাব, গলা খুশখুশ করা ২—৬ দিন পর এসব লক্ষণ মিলিয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে, এদের আর কিছু হয় না। কারুর কারুর বেলায় কিন্তু সাময়িকভাবে কমে অথবা উগ্র আকার ধারণ করে, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়।

মস্তিষ্কের আবরক পর্দার উত্তেজনাজনিত উপসর্গ ও চিহ্ন থাকতে পারে যাদের পক্ষাঘাত হয় তাদের ক্ষেত্রেও, এবং যাদের পক্ষাঘাত হয় না, তাদের ক্ষেত্রেও। পক্ষাঘাত যাদের হয় না, তাদের বেলায় রোগ নির্ণয়ের কোন উপায় থাকে না, যদি না গবেষণাগারে পলিও ভাইরাস ধরা পড়ে। রোগের মহামারীর গতিপ্রকৃতি দেখে অবশ্য কিছুটা আঁচ করা যায়; তবে মহামারীর সময়ে অন্য ধরনের ভাইরাস যেমন, ককস্যাকি ও ইকো-ভাইরাস থেকেই মস্তিষ্কের আবরক পর্দার প্রদাহ হতে পারে।

পক্ষাঘাত হতে যাচ্ছে যে রোগীর, তার পঙ্গুত্বের আগে রোগীটি দুর্বল হয়ে পড়ে, অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল হয় ( hyperesthesic )। মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হয়, যা খুব সাংঘাতিক হতে পারে, কণ্ডরার প্রতিবর্তী ক্রিয়া ( tendon reflex ) স্বাভাবিক বা বেশি তীব্র হয়। এর পরবর্তী স্তরে অঙ্গটির সঞ্চলন সহায়ক ক্রিয়াকলাপ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, যেটা সুসমঞ্জস নয় অর্থাৎ অপ্রতিসাম্য—আক্রান্ত অংশ থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়েও পড়ে না। ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে একটি বা দুটি পা আক্রান্ত হয়, ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে একটি বা দুটি হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। যদি মধ্যচ্ছদা বা বুকের পাঁজরার সঙ্গে সংলগ্ন মাংসপেশীগুলি আক্রান্ত হয়, তাহলে শ্বাসপ্রশ্বাস কমে অক্সিজেনের অভাব হয়। মুখের স্নায়ু বা কানের স্নায়ুতেও পক্ষাঘাত হতে পারে।

মধ্যচ্ছদার পক্ষাঘাত হলে শ্বাসপথে বাধা, গেলা জিনিস উগরে দেওয়া, খাবার শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে পারে।

সংবেদজ কোন ক্ষতি সাধারণত হয় না অর্থাৎ সংবেদনশক্তি বজায় থাকে। যদি মস্তিষ্কের মেডালাতে শ্বাসকেন্দ্র আক্রান্ত হয়, তাহলে সাধারণত মৃত্যু হয়।

## রোগনির্ণয়

পলিওমায়েলাইটিস-এ আক্রান্ত হয়েও যে সব রোগীর পক্ষাঘাত হয় না, তাদের রোগনির্ণয় রোগশয্যাপাশে করা যায় না। পক্ষাঘাত শুরু হলে অন্য ভাইরাস-এর ( ককস্যাদি, ইকো ) কথাও আসে, কিন্তু ঐ সব ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দুর্বলতা দেখা দিলেও প্রতিবর্তী ক্রিয়া বদলে গেলেও সাধারণতঃ ৬০ দিন পর পক্ষাঘাত থাকে না, সেরে যায়।

গবেষণাগারে রক্তমস্তুতে অ্যান্টিবডি থেকে রোগের উপস্থিতি জানা যায়। তবে সব জায়গায় এ ধরনের পরীক্ষা সম্ভব নয়।

## আরোগ্য সম্ভাবনা

একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী যখন দেখা যায়, তখন এটা নিশ্চিত যে আরও ১০—১,০০০ জনের পলিও ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু তাদের পক্ষাঘাত হয়নি। যে সব হেতু খতিয়ে দেখা দরকার ঃ এক বছর পর্যন্ত শিশুদের পক্ষাঘাত হবার ঘটনা কমা II ধরনের পলিওমায়েলাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত হলে পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা বেশি ( I ধরনের পলিও-ভাইরাস থোকে পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা কম )। গর্ভাবস্থায় পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা বেশি। দৈহিক খাটা খাটনি বেশি হলে পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা বেশি। স্থানীয় কোন আঘাতে ( যেমন ইঞ্জেকসান ) পক্ষাঘাত ত্বরান্বিত হয়।

## চিকিৎসা

নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া। বিষমস্তর পার হলে কোন কোন রোগীর বেলায় ফিজিওথেরাপি কার্যকর হয় ; যাদের পক্ষাঘাত এড়ানো যায় না, তাদের কারুর কারুর ক্ষেত্রে হাড়ের অস্ত্রোপচারে কাজ দেয় কিছুটা।

#### প্রতিরোধ

টীকা নেওয়া। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

## হাম (Measles)

হাম ভাইরাস ঘটিত ভীষণ ছোঁয়াচে বিষম অসুখ, সাধারণত শিশুদের জ্বর, কাশি, নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ ( কনজাংটিভাইটিস ) হয়, এবং মুখের ভিতর কপলিক-এর বর্ণনা মত চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, পরে সারা শরীরে ফুসকুড়ি বেরোয়, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে ভাইরাস ছড়িয়ে গেলে বা বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ ঘটলে নানান জটিলতা দেখা দিতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি ও যথাযথ চিকিৎসার অভাব যে সব জায়গায় আছে, সে সব জায়গায় শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হল এই রোগ।

#### কারণ

হামের ভাইরাস প্যারামিকসো ভাইরাস শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দেখতে মোটামুটি গোলাকার, ১২০—২৫০ nm ( ন্যানোমিটার ) ব্যাস বিশিষ্ট, এগুলি আর এন এ ভাইরাস। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় গবেষনাগারে কয়েকসপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে। ৩৭°c এ অর্ধজীবন (halflife) হচ্ছে মাত্র ২ ঘন্টা।

#### মহামারী সংক্রান্ত তথ্য

প্রকৃতিতে এই ভাইরাসের আশ্রয় দাতা মানুষ ও বানর।

হাঁচি কাশি সর্দির সঙ্গে সংক্রামক ব্যক্তির নাক থেকে ভাইরাস বের হয় এবং সংক্রমণ ঘটায়। সংক্রামিত কাপড় চোপড় থেকে সুস্থ শিশুর শরীরে ছড়াতে পারে।

উপরের শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়েই সাধারণতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। নেত্রবর্ত্মকলার ভিতর দিয়েও ঢুকতে পারে।

নাসাপথ ও গলবিলে ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকে রোগীর গায়ে ফুসকুড়ি বেরুবার দুদিন আগে থেকে ফুসকুড়ি বেরুবার ২ দিন পর পর্যন্ত। কিন্তু সম্ভবত ভাইরাস কার্যকর থাকতে পারে আরও বেশি-দিন। ফুসকুড়ি বেরুবার ৪।৫ দিন পরও রোগী সুস্থ শিশুকে সংক্রামিত করতে পারে।

শিশুদের এ এক সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগ, কোন জনপদে ৯০% শিশু সংক্রামিত হতে পারে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বা হঠাৎ রোগীর সংস্পর্শে এলেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট।

পৃথিবীব্যাপী হয়। জাতিভেদ বা স্ত্রী-পুরুষভেদে তারতম্য নেই।

সাধারণতঃ বসন্তকালে শুকনো আবহাওয়াতে হয়, তবে কোন নির্দিষ্ট ঋতু নেই—প্রতি ২।৩ বছর অন্তর মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে, কারণ সংক্রমণযোগ্য শিশুর সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৩০—৪০ শতাংশ।

বস্তি এলাকায় দেখা যায় তিন বছর বয়স পেরোতে না পেরোতেই বেশির ভাগ শিশু হামে ভুগছে। শহর এলাকায়, গাদাগাদি যেখানে কম, সেখানে এই বয়সটা ৬ বছর পর্যন্ত বাড়ে। যদিও নবজাতকেরও হাম হবার ঘটনা আছে, তাহলেও ৬ মাসের নিচের শিশুর হাম বড় একটা হয়না—কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তারা মায়ের কাছ থেকে, অমরার ( প্ল্যাসেণ্টা ) মধ্যে দিয়ে।

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রতি দুমিনিটে একটি করে শিশু মারা যায় হাম রোগের শিকার হয়ে।

## রোগবিদ্যা

ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয় নাক ও গলবিলের অথবা নেত্রবর্ত্মের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে—তারপর তারা ছড়ায় কাছের লসিকাগ্রন্থিগুলিতে। অসুখের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে ভাইরাস ছড়ায় সারা দেহের লসিকা তন্তুতে—রক্তের মাধ্যমে। এ হল রক্তে মুখ্য সংক্রমণ। আর একবার রক্তে গৌণ সংক্রমণ হয় ৫ দিনের দিন। শরীরের ভিতরে বহু যন্ত্রে ভাইরাস

ছড়িয়ে যায়। সংক্রমণের পর ১১ দিনের দিন রোগলক্ষণ পরিস্ফুট হয়, ১৪ দিনে ফুসকুড়ি বেরোয়, তার ২৪—৪৮ ঘণ্টা পর রক্ত থেকে ভাইরাস বিদায় নেয়। রোগলক্ষণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

রক্তে ভাইরাসের যখন অস্তিত্ব থাকে, তখন শ্বেত কণিকা দিয়ে ভাইরাস বাহিত হয়।

হামে চামড়ায় ফুসকুড়ি কেন বেরোয়—তার সঠিক কারণ জানা নেই। স্থানীয়ভাবে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হতে পারে ও চামড়ার বহিঃস্তক ও অন্তঃস্তক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—অথবা দেহে ভাইরাস সংক্রমণের ফলে এটা একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াবিশেষ—যার আঘাত পড়ছে চামড়ার উপর।

লসিকাতন্তুগুলি, যথা লসিকাগ্রন্থি, টনসিল, অ্যাপেনডিকস, প্লীহা, থাইমাস প্রভৃতি বেড়ে ওঠে। মুখের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিচের গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ, তার থেকে পচন—ফোস্কা পড়া—এরই ফলে কপলিক বর্ণিত চিহ্নের সৃষ্টি হয় মাড়ির গোড়ায়।

যখন মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তখন মস্তিষ্কে শোথ, বিন্দু বিন্দু রক্তপাত ও শিরার চারদিকের স্নায়ুর ক্ষত দেখা যায়। রোগলক্ষণ বুঝবার সুবিধার জন্যে রোগবিদ্যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

**রোগলক্ষণ**

কোন শিশুর শরীরে রোগের সংক্রমণ ঘটলে সেই সময় থেকে রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে ১০—২০ দিন পর।

রোগলক্ষণগুলি হল : সর্দি, খকখকে কাশি, চোখ ও নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, চোখে আলো পড়লে শিশুর অসুবিধা হয়। আলোকে ভয় পায়। জ্বর বেশ বেশি, ৩৯°C। সাধারণভাবে শরীরের লসিকাগ্রন্থি সমূহ বেড়ে ওঠে। পিলে বড় হয়।

**কপলিক চিহ্ন :** মুখের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে এই সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানী কপলিক বর্ণিত চিহ্ন দেখা যায়—এটা প্রথম দেখতে পাওয়া যায় নিচে পেষণদন্তের পিছনের দিকে, ভিতরের ঠোঁটে কয়েকটি থাকতে পারে

খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়। দাগটা সাধারণতঃ অসংলগ্ন, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী থেকে আলাদা—ছোট, অনিয়মিত, তাজা লালরঙা I মুখের ভিতর প্রতিটি এরকম চিহ্নের মধ্যিখানে, দিনের আলোতে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় একটা ছোট, নীলাভ-সাদাটে দাগ। এগুলো সমস্ত শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কখনো কখনো নেত্রবর্ত্মে অথবা শিশুর যোনিতে দেখা যায়। এই চিহ্ন হাম রোগের বিশেষ লক্ষণ—এই চিহ্ন দেখলেই বলতে পারা যায় হাম হয়েছে। গায়ে ফুসকুড়ি বেরুবার দুদিন আগে মুখের ভিতরের দিকে এই চিহ্ন দেখা যায়।

সাধারণতঃ রোগলক্ষণ প্রকাশের ৩—৫ দিন ( ১—৮ দিনও হতে পারে ) পর চামড়ায় ফুসকুড়ি দেখা দেয়। ফুসকুড়ি প্রথমে দেখা যায় কান দুটোর পিছনে—বেগুনিরঙের অস্পষ্ট ছাপ ছড়ায় কপালে, চুলের নিচে, শীঘ্র পরের তিনদিনে ফুসকুড়িতে রূপ নেয়—খুব তাড়াতাড়ি নিচের দিকে মুখে, বুকে গলায়, বুকে পিঠে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও ছড়ায়। এই সময়ে প্রথমে যে সব জায়গায় ফুসকুড়ি দেখা গিয়েছিল, সেগুলো চাকাচাকা হয়ে এক হয়ে যায়, বিশেষ করে মুখে এরকমটা হয়ে থাকে।

ফুসকুড়ি বেরুলে সাধারণত জ্বর কমে যায়, শরীরের রোগলক্ষণ-গুলোও কয়েকদিনের মধ্যে কমে যায়। উপর থেকে নিচে ক্রমান্বয়ে ফুসকুড়িগুলি মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। মিলিয়ে যাবার সময় দাগগুলি বাদামী হয়। জ্বর হয়, কখনো কখনো গায়ের-চামড়ার কিম্বা হাতের বা পায়ের চেটোর উপরের চামড়ার একটা আস্তরণ যেন উঠে যায়।

এক ধরনের হামে চামড়া দিয়ে সাংঘাতিক রক্তপাত হয় ( কালো হাম—black measles )। নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত হয় ঐ রক্তপাত, শিশু মারা যায়। সঙ্গে থাকে খুব জ্বর, নিউমোনিয়ায় ধরে। প্রদাহ হয় মস্তিষ্কের। এখন এ ধরনের মারাত্মক হাম খুব কমই দেখা যায়।

আবার যাদের কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগে হাম হয়ে গেছে,

বা যারা হামের টিকা নিয়েছে, তাদের একরকম অস্বাভাবিক হাম হতে পারে—যার লক্ষণসমূহ জ্বর, মাথাব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা, পেটে ব্যথা দুর্বলতা, কবজি ও গোড়ালীতে ফুসকুড়ি শরীরের অন্য জায়গাতেও দেখা দেয়। শোথ হতে পারে, সময় সময় সাংঘাতিক ভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে এ ধরনের রোগী। শরীরে বহুদিনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে এরকমটা ঘটে বলে মনে করা হয়। এ ধরনের ঘটনা অবশ্য খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

জটিলতা

হাম হলে জটিলতা দেখা দেয়, তার কারণ বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ ও সম্ভবতঃ শিশুর নিজের শরীরে হাম-সংক্রমণের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। যে সমস্ত বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ দেখা যায় সেগুলি **স্ট্রে-পটোকক্কাস পায়োজেনস, স্ট্রে-নিউমোনিয়ি ও স্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াস**। যাদের বয়স ৫ বছরের নিচে তারা অনেক সময় **হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা** বীজাণু দিয়েও আক্রান্ত হতে পারে। শিশু মারা পড়ে এ কারণেই।

শিশু ব্রনকোনিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে ফুসফুসধরা ঝিল্লীর প্রদাহ বা বুকের গহ্বরে জল বা পুঁজ জমতে পারে। ফুসকুড়ি বেরুবার তিন দিন পরে রোগলক্ষণ না কমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট যদি বাড়ে, তাহলে সন্দেহ করা উচিত শিশুর নিউমোনিয়া হয়েছে, এ সময় রক্তে শ্বেতকণিকা বাড়ে, লাগাতার জ্বর থাকে, কাশি থাকে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হলে মস্তিষ্কের বিষম প্রদাহ হয় ০·১—০·২ শতাংশের বেলায়। কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে ; ৫০% ক্ষেত্রে একটা মৃদু পরিবর্তন দেখা যায়।

মস্তিষ্কের বিষম প্রদাহ শরীরে ফুসকুড়ি বেরুবার ১—৭ দিনের মধ্যে আরম্ভ হতে পারে—এর লক্ষণ হল শিশুর আচ্ছন্নভাব, বা শিশু উত্তেজিত হয়ে ওঠে—পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গভীরভাবে অজ্ঞান হয়ে যায়—তড়কা হয়। এইরকম মস্তিষ্কের প্রদাহ হলে মৃত্যুহার ৫—১০ শতাংশ।

অর্ধেক রোগীর বেলায় রোগটা পুরোপুরি সেরে যায়, যদিও ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফ করলে মস্তিষ্কের দোষ দেখা যেতে পারে কয়েক মাস অবধি। ৩০—৩৫ শতাংশের বেলায় কোন না কোন সামান্য থেকে সাংঘাতিক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র ঘটিত বৈকল্য থেকে যেতে পারে।

আর এক ধরনের বিস্তৃততর মস্তিষ্কের প্রদাহ—সাব অ্যাকিউট স্ক্লেরোজিং প্যান এনকেফালাইটিস হতে পারে, এতে মৃত্যু প্রায় অবধারিত—শিশুর ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন ঘটে, মানসিক বৈকল্য দেখা যায়, অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যায়, মৃত্যু হয় ৬—৩৬ মাসের মধ্যে। হামে আক্রান্ত হবার ৪—১৭ বছর পরেও এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। এ ধরনের রোগীর মস্তিষ্ক থেকে হামের ভাইরাস পাওয়া গেছে।

মধ্যকর্ণের প্রদাহ—হতে পারে ১০% ক্ষেত্রে। যাদের আগে থেকে কানে কোনরকম সংক্রমণের ইতিহাস থাকে, সাধারণত তাদের হয়। শিশু খুব ছোট হলে তার অসুখের কথা বলতে পারে না, কিন্তু কান টানে! উত্তেজিত অবস্থা থাকে তার, কান থেকে পুঁজ বা রস গড়াতে পারে, ফুসকুড়ি বেরুবার ৩।৪ দিন পরও জ্বর ছাড়তে চায় না।

রক্তে থ্রম্বোসাইটের অভাব ঘটে, রক্তপাত হতে পারে হঠাৎ—নাক দিয়ে বা চামড়ায় ফুসকুড়ি বেরুবার ২—১৪ ( গড় ৬ ) দিনের পর।

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী বা তার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হতে পারে ০·৫—৩৩ শতাংশের বেলায়। ECG করলে পরিবর্তন দেখা যায়। তবে মৃত্যুর হার খুব কম।

চোখের নানারকম প্রদাহ হয়। কেরাটাইটিস হতে পারে। চোখে আলো পড়লে অসুবিধা হয়। নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ হতে পারে। কর্ণিয়া বা অচ্ছেদ্দপটলের ঘা হতে পারে বা চোখে পুঁজ জমতে পারে—এসব জটিলতা খুব কমই দেখা যায়।

পেটের গোলমাল হতে পারে। পেট ব্যথা করে। আন্ত্রিক প্রদাহ এমনকি অ্যাপেনডিক্স-এর প্রদাহ হতে পারে।

হাম সংক্রমণের আরো গৌণফল কিডনীর প্রদাহ, শিশুদের একজিমা

বা হাঁপানি। শিশু আগে যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে থাকলে তা দারুণ-ভাবে বেড়ে যেতে পারে—যাতে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। কেন এসব হয়, ঠিকমত জানা যায়নি।

শিশুদের হামের কথা বলতে গিয়ে আরেকটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে। পোয়াতির যদি হামজ্বরের সংক্রমণ হয়, তাহলে গর্ভপাত বা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু শিশুর কোন অঙ্গবিকৃতি হয় না।

### রোগনির্ণয়

(১) রোগলক্ষণ দেখে

(২) মুখের ভিতরে কপলিক বর্ণিত চিহ্ন দেখে

(৩) রোগ আক্রমণের প্রাথমিক স্তরে এবং ফুসকুড়ি বেরুবার প্রথম দিনে নাকে বর্জ্যপদার্থ থুথু প্রভৃতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট দৈত্যাকার কোষ দেখা যায়। সাক্ষাৎ ইমিউনোফ্লোরেসেণ্ট প্রক্রিয়ায় এসব থেকে ভাইরাস প্রতিবস্তু সনাক্ত করা যেতে পারে; হেমাগ্লুটিনেসন ইনহিবিসন বা কমপ্লিমেণ্ট ফিকসেসন পরীক্ষাও করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এভাবে পরীক্ষা করে হাম নির্ণয় করা হয় না, নির্ণয় করতে গেলে অর্থখরচও বেশ বেশি হয়। গাঁয়ের দিকে এসব সম্ভবও নয়।

### আরোগ্য সম্ভাবনা

ভাল। জটিলতা হলেও ভাল। যাদের বয়স যত বেশি হবে, তাদের আরোগ্য সম্ভাবনা তত ভাল। শ্বাসতন্ত্রের অসুখ বা কানের প্রদাহ দেখা দেয় ৭—১০% ক্ষেত্রে। ১০,০০০ রোগীর মধ্যে যে এক দু'জনের মৃত্যু হয়, তার জন্য দায়ী প্রধাণত নিউমোনিয়া এবং এনকে-ফালাইটিস।

একবার রোগে ভুগলে সারা জীবনের জন্যে প্রতিরোধক্ষমতা জন্মায়। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবার ইতিহাস খুবই বিরল। পুনঃ

সংঘটন বা একবার হয়ে আবার হওয়া ( recurrence )—তাও হয় না।

চিকিৎসা

জটিলতা বিহীন হামজ্বরের চিকিৎসা লক্ষণ অনুযায়ী। সাধারণ যে সব দিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার—

১। রোগী বিছানায় থাকবে, ঘরটা অন্ধকার থাকলে রোগীর পক্ষে আরামদায়ক হয়।

২। তরল জিনিস জল, দুধ প্রভৃতি বেশি খাবে।

৩। জ্বর ও মাথাব্যথা থাকলে অ্যাসপিরিন খেতে পারে।

৪। কাশি কমাবার কোন ওষুধ ব্যবহার না করাই ভাল বরং কফ উঠে আসে যাতে, এরকম ধরনের কোন মিকশ্চার দিলে তাতে কিছুটা উপকার হয়।

৫। চোখের জন্যে কোন বীজঘ্ন মলম বা কর্টিকোস্টেরয়েড মলম কার্যকর নয়।

৬। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এরকম অবস্থা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল বা ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে। এর বেলায় অনেক সময় শ্বাসনালী ফুটো করে নল ঢোকাতে হয়—যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস অব্যাহত থাকে, সেটা নজর রাখতে হয়, তার চিকিৎসা করতে হয়।

৭। বীজাণুর গৌণ সংক্রমণ ঘটলে আগে সম্ভব হলে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত কোন্ বীজঘ্ন ওষুধ কার্যকর এবং কোন্ বীজঘ্ন ওষুধের বিরুদ্ধে রোগীর বীজাণু প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করেছে। রোগীর কফ পরীক্ষা করলে তা জানা যেতে পারে।

৮। কানের প্রদাহের জন্য দায়ী সাধারণতঃ **হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি** বীজাণু—এক্ষেত্রে বীজঘ্ন ওষুধ যথা—এ্যামপিসিলিন বা পেনিসিলিন দেওয়া যেতে পারে, প্রথমেই টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

হাম যাতে সুস্থ শিশুর না হয়, তার জন্য তাকে আগে থেকে কোন

বীজঘ্ন ওষুধ দেবার কোন সার্থকতা নাই, এমনকি আগে থেকে বীজঘ্ন ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) নেবারও দরকার নেই।

৯। হামের জন্য মস্তিষ্কের যে প্রদাহ হয়, তার কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। দেখা গেছে, বেশিমাত্রায় গ্লুকোস্টেররেড বা গামাগ্লোবিউলিন প্রয়োগ করলেও তা কার্যকর হয় না।

**নিয়ন্ত্রণ**

জীবন্ত অথচ ক্ষতিকারক ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, হামের এমন গুণসম্পন্ন ভাইরাস দিয়ে যে টিকা তৈরী করা হয়, তা' শিশুদের হাম হবার আগে ইনজেকসন দিলে হাম প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ ধরনের টিকার জটিলতা কিছু নেই বললেই চলে, নির্ভয়ে নেওয়া যায়।

সাধারণতঃ শিশুর ১২ মাস বয়সে এই টিকা দিতে হয়, তবে যদি কোথাও মহামারী আকারে এ ব্যাধি দেখা দেয়, তাহলে ৬ মাস বয়সেও দেওয়া যেতে পারে।

**কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে টিকা দেওয়া নিষেধ**—চিকিৎসা শুরু হয়নি, এরকম যক্ষা রোগীর ক্ষেত্রে, পোয়াতীর ক্ষেত্রে, লিউকিমিয়া থাকলে, দুষ্ট স্ফীতি (ম্যালিগন্যান্ট টিউমর) দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে গেলে। কোন ওষুধ বা অসুখ, যা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে তার বেলাতেও দেওয়া চলবে না। যেমন নিয়োমাইসিন ওষুধ খেলে শরীরে যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এ টিকা দেওয়া চলবে না।

কোন সংক্রামিত রোগীর সংস্পর্শে আসার আগের দিন বা সেই দিন দিলেও এ টিকা কার্যকর।

টিকার মাত্রা ০·৫ মিলিলিটার, চামড়ার নিচে ইঞ্জেকশন দিতে হয়, কার্যকারিতা বহুদিন, সম্ভবতঃ আজীবন থাকে।

## রিউম্যাটিক জ্বর (Rheumatic fever)

রিউম্যাটিক জ্বরের প্রধান গুরুত্ব হল, এই জ্বর প্রায় ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে—এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তবহা নালীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ

সৃষ্টি করে, অন্যথায় এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর মারা যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। রিউম্যাটিক জ্বরে ভুগলে ৫০—৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি হয়েছে, অথচ রিউম্যাটিক জ্বরের কোন উপসর্গ দেখা যায়নি—এমনটাও দেখা যায়। শিশুরা এই রোগে বেশি ভোগে। রোগ সেরে যায়—পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাইট্রাল স্টেনোসিস নামে হৃৎযন্ত্রের কপাটিকার অসুখে ভোগে, ঐ কপাটিকার ক্ষতি হয়। বেশিরভাগ দেখা যায় ১০—১৫ বছর বয়সে।

**কারণঃ হেমোলিটিক স্ট্রেপটোককাস** বীজাণু 'এ' শ্রেণী সংক্রমণ প্রবণ কোন মানুষে এই অসুখ সৃষ্টি করতে এবং প্রথম আক্রমণ ও পুনরাক্রমণের সময়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কী উপায়ে এরা রোগ ও উপসর্গ সৃষ্টি করে এবং বহুদিন ধরে স্ট্রেপটোককাসের আপাত অবস্থিতি সত্বেও কীভাবে রিউম্যাটিক জ্বরের অস্তিত্ব থাকে, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা নেই। আরও অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবে **হে. স্ট্রেপটো ককাসই** যে দায়ী এই মতই বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর।

**মহামারী সংক্রান্ত তথ্যঃ**

রিউম্যাটিক জ্বর শুরু হয় বীজাণুর সংক্রমণজনিত উপযর্গ দেখা দেবার কয়েকদিন থেকে কয়েকমাস ( ৫ মাস ) পর, গড়ে ১৯ দিন পর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের চেয়ে শীতপ্রধান দেশে বেশি, শীত ও বর্ষায় বেশি, গ্রামের থেকে শহরে বেশি, গাদাগাদি করে লোক যেখানে থাকে, সেখানে বেশি, গরিবদের মধ্যে, অপুষ্টিতে ভোগে যারা তাদের মধ্যে বেশি। বংশগত নয়। ৯০ শতাংশ দেখা দেয় ৫—১৫ বছর বয়সে, ছেলেদের থেকে মেয়েদের বেশি হয়। আইরিস, আংলো-স্যাকসন, ইহুদী ও নিগ্রোদের বেলায় বেশি। কেউ কেউ বলেন নালীহীন গ্রন্থি আড্রেনাল কর্টেকস অবদমিত হলে এ রোগের সম্ভাবনা বেশি। কোন আঘাতের পর ( হঠাৎ পড়ে যাওয়া ) এ রোগ দেখা দেয় অনেকের বেলায়।

টনসিলের বা দাঁতের বা অন্য অঙ্গের প্রদাহ অনেকদিন ধরে চললে অনেক সময় রিউম্যাটিক জ্বর হতে পারে।

উপসর্গ ঃ

হঠাৎ জ্বর শুরু হয়, ১০১—১০৪°F, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, বড় অস্থিসন্ধি ফুলে ওঠে, একটার পর একটা—হাঁটু, গোড়ালী, কনুই ও মানবদেহের অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হয়। কতকগুলি অস্থিসন্ধি একসঙ্গে আক্রান্ত হতে পারে, তবে সাধারণতঃ এক অস্থিসন্ধি থেকে অন্য অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ছড়ায়। খুব যন্ত্রণা থাকে অস্থিসন্ধিতে। সাধারণভাবে বলে অস্থিসন্ধির বাত।

৪০—৫০ শতাংশ শিশুদের হৃৎযন্ত্রের প্রদাহ এবং অথবা কপাটিকার প্রদাহ হয়, জ্বরের প্রথম আক্রমণের সময়ে। অস্বাভাবিক সিসটোলিক বা মধ্যডায়াসটলিক বা অন্য ধরনের ঘর্ঘর শব্দ ( murmur ) শোনা যায়। ৫০ শতাংশের বেলায় হৃৎযন্ত্র বড় হয়ে যায়, এর মধ্যে রক্তাধিক্যের ফলে পীড়িত হৃৎযন্ত্র বিকল হয়ে ( congestive cardiac failure ) পড়তে পারে ৫% ক্ষেত্রে।

অস্থিসন্ধির চামড়ার নিচে রক্তাভ দলা দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। সঙ্কোচন জনিত মাংসপেশীর নড়াচড়ার অসুবিধা এবং এতে সামঞ্জস্য বিধানের অভাবের ফলে এক ধরনের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় কোন কোন রোগীর বেলায়—একে বলা হয় সিডেনহামের কোরিয়া। জ্বরের তীব্র আক্রমণের সময় বা জ্বর সারার কয়েকমাস পরেও এরকম হতে পারে, ৫—১৫% শিশুর বেলায় দেখা যায়। বিরল ক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, পেটে যন্ত্রণা হয়। রক্তের ই এস আর বেশি থাকে। কার্ডিওগ্রাম করলে P—R অন্তর বেড়ে যায়। রক্তে লোহিত কণিকা বাড়ে।

চিকিৎসা ঃ

সন্দেহ হলে চিকিৎসককে খবর দিতে হবে। চিকিৎসায় সোডিয়াম স্যালিসিলেট, অ্যাসপিরিন, বিউটাডিওন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কর্টিজোন ও স্টেরয়েড ধরনের ওষুধও দরকার হয়। চিকিৎসক প্রত্যেক রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে ওষুধ নির্বাচন করেন। ওষুধের খরচ খুব বেশি নয়। ওষুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে, তবে

সব থেকে বড় দরকার বিশ্রাম—রোগীকে বিছানায় বিশ্রাম নিতে হবে যে পর্যন্ত না উপসর্গসমূহ দূর হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রদাহ বা হৃৎযন্ত্র বড় হয়ে গেলে তার কাজকর্ম ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—শক্ত কাজ, খেলাধূলা এসব বন্ধ রাখতে হবে।

রিউম্যাটিক জ্বর হবার পর জ্বর ও অস্থিসন্ধির ব্যথা হয়ত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও শিশুকে দীর্ঘদিন বিশ্রাম নিতে হতে পারে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে হৃৎযন্ত্রের ক্ষতি ও খুঁত এড়ানো সম্ভব।

তবে পরে হালকা ব্যায়াম চলতে পারে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারী। আক্রান্ত হবার পর চিকিৎসা অনেক দিন, অনেক বছর ধরে করতে হতে পারে—এতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা কমবে। বলা বাহুল্য, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক কারণসমূহ সম্পর্কেও সজাগ হতে হবে।

অনেক সময় এটা দেখা যায়, রোগীর মা বাবা বা রোগী নিজেই ভুলে যায় যে, তার কখনও রিউম্যাটিক জ্বর হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্য কোন অসুখের সময় পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ে অসুখটা—হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার খুঁত মাইট্রাল স্টেনোসিস ধরা পড়ে।

রিউম্যাটিক জ্বরের সঠিক চিকিৎসা হার্ট ফেলিওরকে প্রতিহত করা। আবার রিউম্যাটিক জ্বর যাতে আবার না হয়, তার জন্য এসব ব্যবস্থা নিতে হয়ঃ প্রথমেই শরীরের কোথাও দীর্ঘস্থায়ী কোন সংক্রমণের কেন্দ্র থাকলে সেটা চিকিৎসার সাহায্য দূর করা—বিশেষ করে টনসিলের চিকিৎসা ঠিকমত করা, দরকার হলে বারবার যে টনসিল সংক্রামিত হচ্ছে, সেটা অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া।

## হৃৎপিণ্ডের জন্মগত অসুখ

এক হাজারের মধ্যে প্রায় ৯ জন হৃৎযন্ত্র ও রক্তনালীর ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। সমস্যা যদি প্রথমে ধরা পড়ে, গোড়াতেই তাহলে রোগ নির্ণয় সম্ভব এবং এখন ওষুধ দিয়ে ও অস্ত্রোপচার করে জন্মগত অসুখ নিয়ে

জন্মেছে, এমন বেশির ভাগ শিশুরই জীবন রক্ষা করা যায়। জন্মগত হার্টের অসুখ মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি হয়। হার্টের জন্মগত অসুখ নানা কারণে হতে পারে। বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দায়ী। বিরল কোন ক্ষেত্রে কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন যে মা রুবেলা নামক রোগে আক্রান্ত হয় গর্ভাবস্থার প্রথম ২/৩ মাসের মধ্যে; তাদের সন্তান জন্মালে জন্মগত ছানি এবং হৃৎযন্ত্রের বৈকল্য দেখা দিতে পারে। মায়ের সিফিলিস থাকলে বা ডায়াবেটিস থাকলে কোন কোন বৈকল্য দেখা যায়। গর্ভাবস্থার প্রথম তু-মাসের মধ্যে থ্যালিডোমাইড নামে ঘুমের ওষুধ খেলে যে শিশু জন্মায় তার হার্টের দেওয়ালে খুঁত দেখা যায়, শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে। এ ওষুধ আইন করে সব দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে, তাই ওষুধ বিশেষ বাদবিচার করে খেতে হবে। জন্মের সময় কী ধরনের হৃৎযন্ত্রের বিকৃতি দেখা যায়, ২৩১০ টি রোগীর ইতিহাসের ভিত্তিতে তা নিচের সারণীতে দেখানো হল ( সারণী দেখুন )।

হার্টের নির্দিষ্ট শব্দ লাবডুপ-এর বদলে নানা রকম মর্মর ধ্বনি শোনা গেলে, এক্সরে করে যদি দেখা যায় হার্টের আকার আয়তন স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হয়েছে, তাহলে, বুক ধড়ফড় করলে, অস্বাভাবিক শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে, শ্বাসনালীর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হলে, শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিন পর থেকে নীল হতে থাকলে, শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক না হলে, হাতের আঙ্গুলের ডগা মুগুরের মত মোটা হলে, বুকে ব্যথা হলে, হঠাৎ হঠাৎ অজ্ঞান হতে থাকলে, মাথা ধরতে

## সারণী

জন্মের সময় কী ধরনের হৃৎপিণ্ডের খুঁত দেখা যায়—

| অসুখ | শতাংশ |
| --- | --- |
| ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট | ৩০.৫ |
| অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট | ৯.৮ |
| পেটেন্ট ডাকটাস আর্টিরিওসাস | ৯.৭ |
| পালমোনারি স্টেনোসিস | ৬.৯ |
| কো আরকটেসন অব দি অ্যাওটা | ৬.৮ |
| অ্যাওটিক স্টেনোসিস | ৬.১ |
| টেট্রলজি অব ফ্যালট | ৫.৮ |
| কমপ্লিট ট্রানসপোজিসন অব দি গ্রেট আর্টারিজ | ৪.২ |
| পারাসিসাটেনট ট্রানকাস আর্টিরিওসাস | ২.২ |
| ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া | ১.৩ |
| অন্যান্য | ১৬.৩ |
| | ১০০ |

থাকলে, নাক দিয়ে অস্বাভাবিক রক্তপাত হলে, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সহজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে, হার্টের জন্মগত খুঁতের কথা চিন্তা করা উচিত এবং চিকিৎসকে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া উচিত। নানা ধরনের আধুনিক পরীক্ষা যেমন ইসিজি, এক্সরে প্রভৃতির সাহায্যেও এ সব রোগ নির্ণয় করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, যথাসময়ে রোগ ধরা পড়লে এবং অস্ত্রোপচার করলে শিশুর জীবন বাঁচে, আর পাঁচজনের মত শিশু বেড়ে ওঠে। শল্য চিকিৎসা জনিত মৃত্যুর হারও যৎসামান্য।

### ম্যালেরিয়া ( malaria )

মানুষকে রুগ্ন করে এবং মৃত্যু ডেকে আনে যে সব সংক্রামক ব্যাধি, তার মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম। অনুন্নত বা উন্নয়শীল দেশগুলোতে এর প্রকোপ বেশি।

**কারণ ঃ**

**প্লাসমোডিয়াম** বর্গের চার ধরনের ম্যালেরিয়া পরজীবী মানুষকে

আক্রমণ করতে পারে ; (১) প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, (২) প্লা· ফ্যালসিপেরাম (৩) প্লা· ম্যালেরিয়িও (৪) প্লা· ওভেল। প্রথম দু'ধরনের পরজীবীই মানুষকে বেশি আক্রমণ করে। মানুষের সব থেকে মারাত্মক ম্যালেরিয়া পরজীবী হল প্লা-ফ্যালসিপেরাম।

**মহামারী সংক্রান্ত তথ্য ঃ**

সংক্রামিত স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশকী রক্ত চোষার আগে তার লালাগ্রন্থি থেকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়—এরকম বহু স্পোরোজয়েট মানুষের শরীরে লালার সঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়। স্পোরোজয়েট ম্যালেরিয়া পরজীবীর সংক্রামক স্তর। এই জীবকণা থেকেই মানুষ সংক্রামিত হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে রক্তের ভিতর দিয়ে স্পোরোজয়েট চলে যায় যকৃৎ কোষে। সেখানে অযৌন বংশবৃদ্ধি হয়। সংক্রামিত মশা কামড়াবার ১০—১৪ দিন পরে মানুষের রোগ দেখা দেয়, লোহিত রক্ত কণিকা আক্রান্ত হয়।

মশার ভিতরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন জীবনচক্র অতিবাহিত হয়। মানুষের রক্ত খাবার পর মশা সংক্রমণ ছড়াতে পারে সাধারণত, ১০—১৬ দিন পর।

কখনো সখনো মশা ছাড়া অন্য উপায়েও সংক্রমণ হতে পারে— যেমন সংক্রামিত মানুষের রক্ত অন্য রোগীকে দিলে, বা সংক্রামিত সিরিঞ্জ, সূচ প্রভৃতি ব্যবহার করলে, সংক্রামিত মায়ের গর্ভের ফুলে খুঁত থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

বানর প্রভৃতি অন্যান্য জীবেরও ম্যালেরিয়া হয়, তবে, তাদের ম্যালেরিয়া পরজীবী সাধারণত মানুষকে সংক্রমণ করে না।

ম্যালেরিয়া ছিল মৃত্যুর দূত—জ্বরের রাজা। ১৯৩৫ সালে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভারতে প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হত দশ কোটি লোক, মারা পড়ত দশ লক্ষ। ঐ সময় জ্বরে ভুগে মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশ ছিল ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু। শুধু বাংলায় বছরে ৩ লক্ষ মায়ের গর্ভপাত হত ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে। ভারতে জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা চালু হয় ১৯৫৩ সালে, তা রূপান্তরিত হয়ে জাতীয়

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৫৮ সাল থেকে। এক সময় ম্যালেরিয়া কমে গেয়েছিল, কিন্তু ৭০ এর দশকে আবার বাড়তে আরম্ভ করে। এখন ভারতে প্রতি বছর ২০—৩০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে, তবে মৃত্যুহার খুবই কম, বছরে ১০০—১৫০ বা তারও কম।

আফ্রিকা ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলে বছরে এখনো ২ কোটি লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। আফ্রিকার ২০কোটি লোক দীর্ঘদিন ভুগছে ম্যালেরিয়াতে। প্রতি বছর সেখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দশ লক্ষ শিশু মারা যায়।

## রোগ বিদ্যা ঃ

পরজীবী যকৃৎকোষ থেকে বেরিয়ে লোহিত রক্তকণিকায় ঢোকে— সেখানে অযৌনবৃত্ত অতিবাহিত হয়—সংখ্যায় বাড়ে, ফলে লোহিত রক্ত কণিকা ফেটে যায়—প্রতি ঘণ্টা অন্তর প্লা. **ভাইভ্যাক্স** ও প্লা. **ফ্যালসিপেরামের** বেলায়—তখন ১৮ ঘণ্টা অন্তর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়। ৪৮ ঘণ্টা অন্তর বারবার নতুন নতুন লোহিত রক্ত কণিকা সংক্রামিত ও ধ্বংস হবার ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। হেমো-গ্লোবিন ভেঙে রক্তে মেশে, প্রস্রাবের সঙ্গে হেমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসতে পারে। লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যাওয়ার ফলে যে থ্রম্বো-প্ল্যাসটিন বেরিয়ে আসে, তার জন্যেই প্লা.**ফ্যালসিপেরামে** আক্রান্ত হলে রক্তনালীর ভিতর রক্ত জমাট বাঁধে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার আরেকটা বিরল জটিলতা হল অভিঘাত, তাছাড়া মস্তিষ্কের উপশিরাগুলি পরজীবী আক্রান্ত লোহিতকণিকা দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়, মস্তিষ্ক শোথগ্রস্ত হয়, আংটির আকারে রক্তপাত হয়, কেন্দ্রীয় শিরার চারপাশ পচে যায়। মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার বেশি।

## রোগ লক্ষণ ঃ

বেশীরভাগ রোগীর বেলায় দেখা যায় যুগপৎ কাঁপুনি,জ্বর, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া, মাথাব্যথা এবং মাংসপেশীতে ব্যথা। প্রথমে খুব শীত

লাগে ( ২০ মিনিট থেকে এক ঘন্টা ) তারপর খুব জ্বর বাড়ে ( ১০৫°F বা ৪০°C বা তারও বেশি (১—৪ ঘন্টা), তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে (২—৩ ঘন্টা)। **ভাইভ্যাকসে, ফ্যালসিপেরাম** ও **ওভেল** ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি তৃতীয় দিনে জ্বর আসে, **ম্যালেরিয়ি** ক্ষেত্রে প্রতি চতুর্থ দিনে জ্বর আসে।

**ফ্যালসিপেরাম** বা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার বেলায় জ্বর লাগাতার লেগেই থাকতে পারে, ছেড়ে গিয়ে আবার আসতে পারে, বা যতদিন অসুখ থাকে, ততদিনই লাগাতার জ্বর থাকতে পারে, এমনকি কোন কোন সময় জ্বর নাও থাকতে পারে।

মাথাব্যথা থাকে, ভুল বকতে পারে রোগী। রক্তচাপ কমে, ঠোঁটে কখনও কখনও হারপিস দেখতে পাওয়া যায়।

মস্তিকের ম্যালেরিয়ায় মাথাব্যথা, আচ্ছন্নতা, তড়কা, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, উত্তেজনা, ভুলবকা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। এরকম ক্ষেত্রে যথাসময়ে যথাযথ চিকিৎসা না করলে শতকরা ৫০ জন রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অন্য জটিল উপসর্গও দেখা দিতে পারে, যেমন কলেরার মত পায়খানা, রক্তবমি বা রক্তপ্রস্রাব, অভিঘাত বা আকস্মিক ক্রিয়াশক্তি লোপ। তখন কিন্তু কোন জ্বর থাকে না। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বিষম ম্যালেরিয়ায় ৫০% ক্ষেত্রে প্লীহা বড় হয়। যকৃৎ বড় হয় কমক্ষেত্রেই এবং যকৃৎ বড় হলে তার সঙ্গে প্লীহাও বড় হবে। যদি প্লীহা ও যকৃৎ বড় নাও হয়, তাহলেই ম্যালেরিয়া হয়নি একথা বলা চলে না।

যদি ম্যালেরিয়ার কোন চিকিৎসা না করা হয়, এবং কোন জটিলতা দেখা না দেয়, রোগী প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে, তার প্লীহা বড় হয়। চিকিৎসা না করলে **ফ্যালসিপেরাম** ম্যালেরিয়াতে ভুগে এরকম সেরে উঠতে সময় লাগে এক বছর, ভাইভ্যাকস এর ক্ষেত্রে তিন বছরে।

যারা দীর্ঘদিন ভুগছে, তাদের কারুর কারুর রক্তে স্বল্প পরিমাণ

সংক্রমণ থাকতে পারে, এদের কোন রোগলক্ষণ দেখা যায় না—এরকম কেউ যদি রক্তদান করে, তাহলে যে রক্তগ্রহণ করছে সে সংক্রামিত হয়।

**রোগ নির্ণয়ঃ**

ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের শ্লাইডের উপর আঙ্গুল থেকে স্চ ফুটিয়ে রক্তের মোটা ও সরু সর ( film ) টেনে যথাবিধি রঙ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়া পরজীবী দেখা যায়। যদি রোগলক্ষণ দেখে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে ম্যালেরিয়া হয়েছে, তাহলে রক্তে বারবার পরীক্ষান্তে ম্যালেরিয়া খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে। নানা অপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা আছে, সে সবের সুযোগ সুবিধা সীমিত।

**আরোগ্য সম্ভাবনাঃ**

**ফ্যালসিপেরাম** ছাড়া অন্য ধরনের ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু বিরল। **ফ্যালসিপেরাম** ম্যালেরিয়ায় যে সব জটিলতা দেখা দেয়ঃ (১) রক্ত ভেঙে যাওয়ার ফলে রক্তাল্পতা (২) মস্তিষ্ক, (৩) বৃক্ক, (৪) যকৃৎ ও (৫) ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে, (৬) রক্তবহা নালীতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়া আরম্ভ হবার আগে একটা বিষম মানসিক পরিবর্তন, যেমন বিভ্রান্তি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, স্থানকালপাত্র চিনতে বা বুঝতে না পারা, বুদ্ধির স্থূলতা প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়।

**চিকিৎসাঃ**

যদিও কোন কোন ম্যালেরিয়া পরজীবী (যেমন **ফ্যালসিপেরাম**) কোন কোন ওষুধের বিরুদ্ধে (যেমন ক্লোরোকুইন) প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে, তাহলেও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ওষুধ আছে, চিকিৎসা করলে অসুখ সারে। যে **ভাইভ্যাক্স ও ওভেল** ম্যালেরিয়ায় যকৃতে গৌণ আযৌনবৃত্ত ৩ বছর বা তারও বেশি চালু থাকতে পারে, চিকিৎসায় রোগ লক্ষণ সেরে যাবার পরেও যাতে তার থেকে পুনরাক্রমণ

(relapse) না হয়, সেজন্য পরজীবীর যৌণবৃত্ত ধ্বংস করার ওষুধ দিতে হবে। চিকিৎসার সময় এ দিকটা খেয়াল রাখা উচিত। মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে।

প্রতিরোধঃ

ম্যালেরিয়ার কোন প্রতিষেধক টিকা এখনো বের হয়নি, তবে বের হবার তোড়জোড় চলছে, সারা পৃথিবী জুড়ে। অ্যানোফেলিস মশা যাতে না কামড়ায় তার জন্যে মশারি ব্যবহার করতে হবে। জামা-কাপড় এমন পরতে হবে, যাতে মশা না কামড়ায়। ম্যালেরিয়ার মশা রাতের বেলাতেই কামড়ায়।

কোন কোন ওষুধ নিয়মিত খেলে, যেমন ক্লোরোকুইন (১ বছরের আগে ৩৭ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে, ১—৩ বছর ৭৫ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে, ৪—৭ বছর ১১২ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে, ৮—১২ বছর ১৫০ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে, ১২বছরের উপর ৩০০ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে) ম্যালেরিয়া হয় না। যেখানে ক্লোরোকুইনের বিরুদ্ধে পরজীবীর প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে, সেখানে পাইরিমেথাসিন ও সালফাডায়াজিন যুক্ত ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে সপ্তাহে ১টি করে। তবে যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া আছে, সেখানকার লোকেদের এরকম সারা জীবন প্রতিরোধী ওষুধ খাওয়া তো সম্ভব নয়—আবার এ-ধরনের ওষুধ দীর্ঘদিন খেলে ম্যালেরিয়া পরজীবী ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

## কালাজ্বর ( kala-azar )

এক ধরনের পরজীবী সংক্রমণের ফলে কালাজ্বর হয়। আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে এ রোগ দেখা যায়। মহামারী সংক্রান্ত তথ্য : জাতীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ডিডিটি ছড়ানোর ফলে রোগের বাহিকা স্যাণ্ডফ্লাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলে ভারত থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছিল কালাজ্বর। সাতের দশকে বিহারে

আবার মহামারী আকারে দেখা দিল কারণ ডিডিটি ছড়ানো বন্ধ করার ফলে স্যাণ্ডফ্লাই পোকা বেড়ে গিয়েছিল। বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে এ রোগটা মহামারী আকারে দেখা দেয় মালদায়, তারপর ছড়ায় মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, পঃ দিনাজপুর, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতির কোন কোন জায়গায়। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৫,৫০০ লোক পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা আনুমানিক ৪০। শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের একটি সমীক্ষায় কোন্ বয়সে কত শতাংশ লোক আক্রান্ত হয়, তার সারণী দেওয়া হল।

সারণী

মালদা জেলায় বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কালাম্বরের খতিয়ান

| বয়স ( বছর ) | পুরুষ | স্ত্রী | মোট | শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| ০—৫ | ২৯ | ১৮ | ৪৭ | ৫৩.৫ |
| ৬—১০ | ৩৩ | ২৭ | ৬০ | |
| ১১—১৫ | ২৬ | ১৫ | ৪১ | ৩৩.০ |
| ১৬—২০ | ১৭ | ৮ | ২৫ | |
| ২১—২৫ | ১০ | ৪ | ১৪ | ৬.৫ |
| ২৬—৩০ | ৩ | ৪ | ৭ | |
| ৩১—৩৫ | ১ | — | ১ | |
| ৩৬—৪০ | ২ | ১ | ৩ | |
| ৪১—৪০ | ২ | — | ২ | |
| | ১২৩ | ৭৭ | ২০০ | ১০০.০ |

গাঁয়ের রোগ এটি, মাটির অন্ধকার কুটিরে রোগ ছড়ায়। কোন কোন গাঁয়ের ৩০ শতাংশ মানুষের হয়েছে। এমনও দেখা গেছে, প্রায় সব ঘরেই একজন না একজন রোগী রয়েছে। মালদা, পশ্চিম দিনাজপুরে সাঁওতালদের মধ্যে বেশি, চব্বিশ পরগণায় কিছু ওরাও উপজাতির মধ্যে।

**কারণ ঃ**

যে পরজীবী থেকে কালাজ্বর হয়, তার নাম **লিসমামিয়া ডোনোভানি**—এরা প্লীহা, মজ্জা, লসিকাগ্রন্থি প্রভৃতির ভিতর এক ধরনের বিশেষ কোষে আশ্রয় নেয় ও সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ভারতে **ফ্লেবটোমাস আর্জেন্টিপেস** নামে এক ধরনের স্যাণ্ডফ্লাই রোগের বাহিকা। স্যাণ্ডফ্লাই-গুলো গোয়াল ঘরে বা মাটির ঘরে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় অন্ধকারে বংশ-বৃদ্ধি করে। গোরু ও মানুষকে কামড়ায়। ভারতে মানুষই পর-জীবীর একমাত্র আশ্রয়দাতা। এখানে কোন জন্তু এ রোগের পোষক নয়। যার কালাজ্বর হয়েছে, তার রক্ত খেলে স্যাণ্ডফ্লাই-এর শরীরে রক্তের সঙ্গে পরজীবী চলে আসে, বংশবৃদ্ধি হয়। রোগ ছড়াতে গেলে ঐ স্যাণ্ডফ্লাইকে ৭ দিন অন্ততঃ বাঁচতে হবে। ৭ দিন পর সুস্থ মানুষকে কামড়ালে পরজীবীগুলি স্যাণ্ড-ফ্লাই-এর চোষনাঙ্গ দিয়ে মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। সংক্রমণ থেকে রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবার সময় ৩—৬ মাস ( সব থেকে কম দশ দিন, সব থেকে বেশি আড়াই থেকে দশ বছর )।

আগে আসাম ও বাংলায় মহামারী আকারে হত। অন্যান্য এলাকা-গুলো ছিল কেপ কমোরিন, তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি। বিহারে এখনো গড়ে বছরে দশ হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছে।

ছেলেদের বেশি হয় ( ছেলে ঃ মেয়ে :: ৪ ঃ ১ ) গ্রামে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছড়ায়। এক ঘরে ৭ জন শিশুরই হয়েছে এমনও দেখা গেছে। সংক্রামিত লোক এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিয়ে যায়, সে গ্রাম আগের গ্রামটা থেকে অনেক দূরেও হতে পারে।

**রোগবিদ্যা ঃ**

মানুষ সংক্রামিত হলে ম্যাক্রোফেজ নামের কোষগুলি পরজীবী গিলে ফেলে। এদের বংশবৃদ্ধি হয় প্লীহা, মজ্জা লসিকাগ্রন্থির বিশেষ এক ধরনের কোষের ভিতর । যে সব লোকের শরীরে কোষবাহিত প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি না হয়, পরজীবী তাদের চামড়াকে আক্রমণ

করে, দেহের সব জায়গায় চামড়া আক্রান্ত হতে পারে, অনেকটা কুষ্ঠের মত দেখায়।

**রোগলক্ষণ ঃ**

স্যাণ্ডফ্লাই পোকা শরীরের যেখানে কামড়ায়, সেখানে কোন ক্ষতচিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত সেটা এত ছোট যে চেনা যায় না।

হঠাৎ রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সাধারণত ধীরে ধীরে রোগলক্ষণ শুরু হয়।

যখন হঠাৎ তীব্রভাবে আরম্ভ হয়, তখন ১০৪°F জ্বর হতে পারে। কখনও কখনও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, দুবার জ্বর, ওঠে ২৪ ঘণ্টায়। দীর্ঘস্থায়ী রোগের বেলায় জ্বর সামান্যই থাকে, এমনকি নাও থাকতে পারে—আবার এমনও হয় জ্বর খুব বেশি কিন্তু রোগী তেমন কোন রকম কাহিল হয় না—কাজকর্ম করে, ঘুরে বেড়াতেও পারে। মাসের পর মাস রোগটা চলতে থাকে।

কাশি থাকে, অনেক সময় গৌণভাবে নিউমোনিয়া বা যক্ষার সংক্রমণ হয় এবং এই নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পেট খারাপ, আমাশয়, নাকদিয়ে রক্তপড়া দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে জ্বর।

সব থেকে লক্ষণীয় বুকের বাঁ দিকে পাঁজরার নিচে ব্যথা—প্লীহা বড় হয়, ধীরে ধীরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নাভির দিকে, নাভির নিচে পর্যন্ত চলে আসে, প্রথমে নরম থাকে তারপর শক্ত হয়ে যায়। লিভার, বাড়ে, তবে খুব বেশি নয়। ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে ন্যাবা হয়।

ভারতে সাধারণত লসিকাগ্রন্থি বড় হয় না। সম্প্রতি এরকম কয়েকটি রোগী পাওয়া গেছে যাদের বিভিন্ন জায়গায় লসিকাগ্রন্থি বড় হয়েছে—কুঁচকি, বাহুর নিচে, গলা প্রভৃতি জায়গায়।

যত দিন যায়, তত রক্তাল্পতা দেখা দেয়, শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে, গায়ের রং কালো হয়, বিশেষত মুখ, পা ও হাতের পৃষ্ঠদেশ-সেই জন্যেই রোগের নাম হয়েছে কালাজ্বর। যদি চিকিৎসা না করা হয়, রোগ বেড়ে যায়, শরীর ক্ষয়ে যায়, শোথগ্রস্ত হয়, পেটে জল জমে, ন্যাবা হয়,

চামড়া ও অন্যান্য নানা জায়গা থেকে রক্তপাত হতে পারে, এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।

রোগ নির্ণয় :

(১) পরজীবী আছে কী না দেখতে হবে, রক্তফলক থেকে মজ্জা নিয়ে বা প্লীহার সামান্য অংশ সূচ দিয়ে টেনে রক্ত বের করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে। এটি চিকিৎসকের কাজ (২) রক্তমস্তুর অ্যালডিহাইড ও চোপরা পরীক্ষা ধনাত্মক হতে পারে। সব সময় হয় না, বিশেষত রোগের প্রথম অবস্থায়। সঠিক নির্ণয়াত্মক বলা যায় না। অন্যান্য পরীক্ষাও আছে—তবে আমাদের দেশে সেগুলো করা কঠিন ও ব্যয়-সাপেক্ষ।

আরোগ্য সম্ভাবনা :

যদি চিকিৎসা ঠিক মত করা না হয়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সারার দু বছর পরে কালাজ্বরপরবর্তী চামড়ার সংক্রমণ হতে পারে (পোষ্টকালাজ্বর ডারমাল লিসমানিয়াসিস) মুখ, বাহু বা শরীরের ঊর্ধাঙ্গের চামড়ায় ছোপ ছোপ সাদাটে দাগ দেখা যায়—চামড়ার রক্ত বিবর্ণ হয়ে যায়, দেখতে সংক্রামক নয় এরকম কুষ্ঠ রোগীর মত—কিন্তু অবশ নয় এলাকাগুলো। আবার আঁচিলের মত, ফুস্কুড়ির মত, সংক্রামক কুষ্ঠ রোগীর ফুসকুড়ির মত দেখায়। এসব জায়গা বেছে নিয়ে দেখলে রোগের পরজীবী পাওয়া যাবে। চামড়ায় পরজীবী যখন পাওয়া যায়, তখন শরীরের ভিতরের কোন যন্ত্রে আর পরজীবী থাকে না।

চিকিৎসা না করা হলে কালাজ্বর বেশ কয়েক মাস বা বছর ধরে শরীরে বাসা বেঁধে থাকতে পারে। চিকিৎসা না করলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। মৃত্যুর কারণ দুর্বলতা ও অন্যান্য অসুখের আক্রমণ (আমাশয়, নিউমোনিয়া, যক্ষা প্রভৃতি)। পরবর্তী স্তরে যকৃতের সিরোসিস হতে পারে দশ শতাংশ ক্ষেত্রে।

চিকিৎসা :

আগে ছিল ইউরিয়া ষ্টিবামিন। এখন পাওয়া যায় না। এখন

পেটাভ্যালেণ্ট অ্যান্টিমনি যৌগ-সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট ব্যবহার করা হয়। রোগ সারে। ইঞ্জেকসান দিতে হয় বয়স অনুসারে—প্রথম বার একবার করে রোজ ১২ দিন, তারপর ১৫ দিন বিরতি, দরকার হলে আরও পনেরোদিন। তিনটে কোর্সও দেওয়া যেতে পারে, তেমন দেখলে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরজীবি মারতে এই ওষুধটি কার্যকর হয় না। তখন অন্য ওষুধ দিতে হয়। সে সব ওষুধ এদেশে তেমন পাওয়াও যায় না।

কালাজ্বর পরবর্তী চামড়ার সংক্রমণে অনেক-দিন ধরে বেশি মাত্রায় ইন্‌জেকসন নিতে হয়। চামড়ার সংক্রমণে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু সারতে দেরি লাগে এবং এ ধরনের সংক্রমণ থাকলে স্যাণ্ডফ্লাই এদের থেকে অন্য সুস্থ লোকের শরীরে রোগ ছড়াতে পারে।

**নিয়ন্ত্রণ ঃ**

(১) ভারতে মানুষই পরজীবীর একমাত্র আশ্রয় দাতা। কাজেই যে এলাকায় এ রোগ আছে, সেখানে খুঁজে বের করতে হবে সব রোগী ও তাদের চিকিৎসা করতে হবে। এতে মোটামুটি ভাবে রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

(২) DDT ছড়িয়ে স্যাণ্ডফ্লাই সহজে মারা যায়। এরা এখনো ডিডিটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেনি। যেখানে মহামারী আকারে রোগ দেখা দিয়েছে, বা দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে DDT স্প্রে করতে হবে।

## জাপনীজ এনকেফালাইটিস ( Japanese encephalitis )

জাপনীজ এনকেফালাইটিস-এর অন্য নাম হল জাপানীজ বি এন-কেফালাইটিস বা রাশিয়ান অটাম এনকেফালাইটিস। ১৮৭১ সালে জাপানের জনসাধারণ এই রোগের লক্ষণগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জাপানী গবেষকবৃন্দ ১৯৩৪—৩৫ সালে প্রথম রোগলক্ষণযুক্ত রোগীর

শরীর থেকে ভাইরাস আবিষ্কার করেন। জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত এই রোগ ছড়িয়েছে।

১৯৭০-এর দশকে মহামারীর আকারে আমাদের দেশে হঠাৎ এ রোগ আত্মপ্রকাশ করেছে। আগে অস্তিত্ব তেমন ছিল না বললেই হয়। ১৯৫৫ সালে অবশ্য মাদ্রাজে (তামিলনাড়ু) বিক্ষিপ্ত ভাবে ৬ জন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে প্রায় ১০০০ বর্গমাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহামারী রূপে জাপানীজ এনকেফালাইটিস আত্মপ্রকাশ করল—ঐ বছর জুন থেকে নভেম্বরে আক্রান্ত প্রায় ৭০০ জন, মারা গেল ৪০—৫০%। এ রোগ এখন অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়েছে।

**কারণ ঃ**

রোগটি ভাইরাস থেকে হয়। বি শ্রেণীর আর্বো ভাইরাসের অন্তর্গত এটি একটি টোগা ভাইরাস। বর্তমান মহামারীর সময়ে প্রকৃতিতে **কিউলেক্স ভিষ্ণুয়াই** মশা থেকে বারবার এই ভাইরাস পাওয়া গেছে, তাই পশ্চিমবঙ্গে এই মশা এই রোগের বাহিকা। এ মশা গাঁয়ে ধানক্ষেতে জন্মে।

**মহামারী সংক্রান্ত তথ্য ঃ**

ভাইরাসটির আশ্রয়স্থল সম্ভবত কোন পশু বা পাখি। শূকরকে সন্দেহ করা হয় ভাইরাসের আশ্রয়দাতা হিসাবে—শূকরের রক্তে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে পারে ও সপ্তাহখানেক থাকতে পারে। স্তন্যপায়ী বাদুড় ও রাতের সারস, বক এবং অন্য পাখির রক্তেও ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মশা ঐ রকম কোন সংক্রামিত জন্তুকে কামড়ালে সংক্রামিত হয়। কিউলেক্স ভিষ্ণুয়াই মশা যেমন পশুর রক্ত খায়, সেইরকম মানুষেরও রক্ত খায়। কোন সংক্রামিত মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

মানুষের রক্তে ভাইরাসের অস্তিত্ব ২৪ ঘণ্টার বেশি থাকে না। তাই

মানুষ থেকে মানুষে এ রোগ ছড়ায় না। আসলে জন্তু—মশা—জন্তু এই বৃত্ত ঘিরে ভাইরাস বিদ্যমান থাকে প্রকৃতিতে, মানুষ আকস্মিক-ভাবে আক্রান্ত হয়। সব মানুষে আবার সাংঘাতিক যে সব রোগলক্ষণ, তা প্রকাশ পায় না, বলা হয়, একটি মানুষ সাংঘাতিকভাবে রোগাক্রান্ত হলে জানতে হবে আশে-পাশের আরও ১০০০ জনের সংক্রমণ হয়েছে—যাদের রক্তে অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে—কিন্তু তাদের রক্তে তেমন কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে না, কোন ক্ষতিও তাদের হবে না, বরং টিকা নিলে যে ফল হয়, তাদের সে ফল লাভ হবে। আর কখনও জাপানীজ এনকেফালাইটিস রোগ হবে না।

এ রোগে দেখা গেছে, ৫ বছর বয়সের নিচের শিশু বেশির ভাগ আক্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে অনেকের অনেক জটিলতাও দেখা দেয়, অসুখটি হবার ফলশ্রুতি হিসাবে। প্রাপ্তবয়স্করাও আক্রান্ত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল নিচের সারণীতে—কোন্ বয়সের কত শতাংশ লোক আক্রান্ত হয়েছিল, দেখানো হয়েছে।

সারণী ঃ

পশ্চিমবঙ্গে বয়স অনুযায়ী রোগাক্রান্ত শিশুর সমীক্ষা ভিত্তিক শত করা হিসাব

| বয়স | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| ০—১ | ৪৯ | ২·৮৫ |
| ১—৪ | ১৩৮ | ৮·০৪ |
| ৫—৯ | ২৬২ | ১৫·২৬ |
| ১০—১৪ | ২৩১ | ১৩·৪৬ |

বর্তমান মহামারীতে দেখা গেছে, যাঁরা শূকর পালন করেন, তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোক, অথবা উপজাতি-সাঁওতাল প্রভৃতি যাঁরা শূকরের সঙ্গে বা পাশাপাশি থাকেন, তাঁদেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে এ রোগ। কোন পরিবারে সাধারণত একজনের বেশি আক্রান্ত হয়নি। কোন গ্রামে সাধারণত একজনের বেশি এ রোগ হয়নি। মৃত্যুহার প্রথম

অবস্থায় বেশি ছিল, পরে কমেছে কিছুটা। জাপানে মৃত্যুহার এখন নগণ্য।

এ দেশে এরোগ কেন এতদিন ছিল না, কীভাবে এল এবং কেন এতটা বিস্তার লাভ করল, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায়নি।

### রোগবিদ্যা

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র শোথগ্রস্থ হয়। মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেকস, সেরিবেলাম ও স্নায়ুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও পচে যায়। পাশের কলা ও রক্তনালীর উপরও চাপ পড়ে। সেরিবেলামে পার্কেঞ্জীর কোষসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এটি চোখে পড়ার মত, সুষুম্নাকাণ্ডও রেহাই পায় না। মোট কথা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বড় রকমের ধাক্কা দেয়।

### রোগলক্ষণ

মশা সংক্রামিত জন্তুর রক্ত খায়। ১০—১২ দিন পর মশা সংক্রমণ ছড়াতে পারে। মানুষকে সংক্রামিত মশা কামড়ালে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় ৬—৮ দিন পর। রোগটি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, অথবা রোগলক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকট হতে পারে। প্রথমে শুরু হতে পারে অল্পস্বল্প জ্বর নিয়ে। রোগের প্রথম অবস্থা হয়ত ঠিকমত চেনা যায় না, সাধারণ সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য সংক্রমণ মনে হতে পারে।

অথবা হঠাৎ খুব বেশি জ্বর, মাথাব্যথা ও বমি শুরু হতে পারে। জ্বর সব সময় লেগে থাকে, তুলনামূলক ভাবে নাড়ীর গতি কম থাকে।

রোগী দুর্বল ও অশক্ত হয়ে পড়ে, মুখ হয় ভাবলেশহীন। রোগীর মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, ভুল বকে, তড়কা বা কাঁপুনি হয়। শিশুর বেলায় এ লক্ষণগুলো প্রথমেই দেখা দিতে পারে। ধীরে ধীরে শিশু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, জ্ঞান হারায়। সঞ্চালক সহায়ক ( motor ) ও সংবেদজ ( sensory ) স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে—ফলে কথা বলতে অসুবিধা হতে পারে—চোখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি

কখনো বা আক্রান্ত হয়। পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটতে পারে শরীরের যে কোন জায়গায়।

গলা সাধারণত শক্ত হয়ে থাকে, বেঁকাতে গেলে, ঘাড় তুলতে গেলে ব্যথা, যন্ত্রনা হয়। প্রতিবর্তী বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

রক্ত পরীক্ষা করলে প্রথমে শ্বেতকনিকা বেশি দেখা যাবে, তারপর শ্বেতকনিকার সংখ্যা ও শতাংশ কমে যাবে। শিরদাঁড়া ফুটো করে জল বের করলে তা' পরিষ্কার দেখায়, কিন্তু চাপ বেশি থাকে। কোষ সংখ্যা বেশি থাকতে পারে ঐ জলে, আমিষ জাতীয় পদার্থও কিছুটা বেড়ে যায় স্বাভাবিকের তুলনায়।

**আরোগ্য সম্ভাবনা**

রোগ ভোগের কাল কারুর বেলায় বেশি, কারুর কম। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী বেশ কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকলেও হঠাৎ তার অবস্থার উন্নতি ঘটে। সেরে উঠতে দীর্ঘদিন লাগে। রোগ শুরু হবার দশদিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে।

**জটিলতা**

শিশুদের বেলায় জটিলতা দেখা দেয় বেশি—জটিলতা আবার সাংঘাতিক আকার ধারণ করতে পারে খুব ছোট শিশুদের বেলায়। শিশু একটুতেই ঘাবড়ে যায়, কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন হয়, আঙ্গুল বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপে, সমন্বয়বিধান করতে পারে না কোন কিছুতে, মানসিক পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন সময় পক্ষাঘাত হলে তা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়না, কিছুটা থেকে যেতে পারে। কথা বলার অসুবিধা বরাবরের জন্যে থেকে যেতে পারে, চলতে গেলে নড়বড় করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কারুর শক্ত হয়ে যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে পাগলামির লক্ষণও দেখা দেয়।

## চিকিৎসা

কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। ভাইরাস ধ্বংসকারী কোন ওষুধ বের হয়নি। কিন্তু লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তে ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন পরজীবী আছে কী না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের পথে যেন কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, এ দিকে সব সময় নজর রাখতে হবে।

রোগীর পায়খানা প্রস্রাব ঠিকমত হচ্ছে কী না, খেয়াল রাখতে হবে।

রোগীর শরীরে যাতে জলীয় অংশের অভাব না ঘটে, দেখতে হবে। মুখ দিয়ে গ্লুকোজের জল পান করাতে হবে। যদি দরকার মনে করা হয়, তাহলে ২৫% গ্লুকোজ শিরার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বা বোতলে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু আকারে ৫% গ্লুকোজ (5% ড্রিপ) দিতে হবে শিরার মধ্যে।

রোগীর পুষ্টির যাতে অভাব না হয় কোন রকম, তার জন্যও লক্ষ্য রাখতে হবে।

রোগী যদি অস্থিরতা দেখায়, তাহলে ডায়াজেপাম দিতে হবে—খাওয়ানো বা ইনজেক্শনের মাধ্যমে।

মাথা ধরার জন্য প্যারাসিটামল বা কোডিন সালফেট দেওয়া যেতে পারে ১।৪ বার।

কোন কোন সময়ে নাকে নল ঢুকিয়ে ( রাইলন নল ) তা, দিয়ে তরল জিনিস খাওয়ানো দরকার হতে পারে।

বিছানায় একই ভাবে শোয়ার ফলে বিছানার সংস্পর্শে শরীরের যে অংশ থাকে, তাতে যাতে ঘা না হয়, তার জন্য রোগীকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক পাশ ফিরিয়ে দিতে হবে। ফুসফুসের গৌণ সংক্রমণ যেন না হয়, সে দিকে লক্ষ্যও রাখতে হবে। খুব বেশি জ্বর হলে জ্বর কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে, ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোওয়াতে হবে, বরফ পাওয়া

গেলে মাথায় বরফ দিতে হবে, দরকার হলে সারা শরীর ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জ করাতে হবে।

### নিয়ন্ত্রণ

**টিকা**—খুবই কার্যকর। সাধারনত তুবার নিতে হয়। সপ্তাহ অন্তর ১ মিলিলিটার মাত্রায়। ভারতে এ টিকা এখনো তৈরি হয়নি। তবে চেষ্টা চলছে, শীঘ্রিই বাজারে বেরুবে।

**মশা নিয়ন্ত্রণ—কিউলেক্স** ভিষ্ণুয়াই মশা এখনো সাধারণ কীট-নাশকের বিরুদ্ধে (ডিডিটি, গ্যামাকসেন) প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এগুলো এখনো কার্যকর। মহামারীর আগে যে অঞ্চলে মহামারী দেখা দেবার সম্ভাবনা, সেখানে ঐ সব কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে, মশার সংখ্যা এতে কমবে।

**ব্যক্তিগত ব্যবস্থা**—মশা যাতে কামড়াতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা, সন্ধ্যা থেকে জামাকাপড়ে শরীর ঢেকে রাখা, শিশুদের বেলায়ও এটা খেয়াল রাখা, তাকে মশারীর ভিতর রাখা। শূকরের সঙ্গে একত্রে না থাকা।

## শিশুর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ

**তড়কা**—মৃগীরোগ থাকলে অনেক শিশু অজ্ঞান হয়ে যায়। এরকম ইতিহাস না থাকলে তড়কা হলে চিকিৎসককে সঙ্গে সঙ্গে দেখানো দরকার। এমন কি মৃগীজনিত মূর্ছার ইতিহাস থাকলেও যদি মূর্ছা ১০—১৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ডাক্তার দেখাতে হবে বা ডাক্তার না পেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দাঁত ওঠার সময় কখনো তড়কা হয় না। তড়কার কারণ অনেক—যেমন মস্তিষ্কের আবরক পর্দার প্রদাহ, জাপানীজ এনকেফালাইটিস প্রভৃতি। কিন্তু ৬ মাস থেকে ৫ বছরের বেশির ভাগ শিশুর তড়কা হয় হঠাৎ জ্বর বাড়লে। তবে তড়কা হলে কী থেকে হয়েছে, এটা সঠিক জানার জন্যে

চিকিৎসক ডাকাই সব আগে দরকার। দাঁত ওঠার সঙ্গে তড়কার কোন সম্পর্ক নেই।

**বমি**—সাধারণতঃ সংক্রমণের জন্যে হয়, তবে সব সময় নয়। কখনো কখনো খাদ্যে বিষক্রিয়ার বা আন্ত্রিকপ্রদাহের এটা প্রথম লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। যে সব সাধারণ সংক্রমণের জন্য শিশুরা বমি করে—তা, হল টনসিলের প্রদাহ বা মধ্যকর্ণের অসুখ, মেয়েদের বেলায় মূত্র পথের সংক্রমণ ( পায়েলো নেফ্রাইটিস ) কখনো বা বমির জন্যে দায়ী, এধরনের সংক্রমণ ছেলেদের কম হয়। হুপিংকফ হলে বমি হতে পারে। অন্য অনেক কারণেও বমি হতে পারে, যেমন অ্যাপেণ্ডিক্স্-এর প্রদাহ, মেনিনজাইটিস বা অন্ত্রের পথে বাধা (intestinal obstruction)। কোন কোন সময় শুধু উত্তেজনার জন্যেই শিশুর বমি হয়, কিম্বা আজে বাজে জিনিস খাওয়ালে। কিন্তু যদি বারবার বমি করতেই থাকে, বা আচ্ছন্নতা ভাব থাকে, জ্বর থাকে, ক্ষুধামান্দ্য থাকে বমির সঙ্গে, শিশুকে যদি দুর্বল এবং কাহিল মনে হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দাঁত গজানোর সময় শিশু কখনই বমি করে না।

**মাথাধরা**—বেশির ভাগ শিশুর কখনো সখনো মাথা ধরে, অনেকের আবার আধকপালী থাকে, মা বাবার কাছ থেকে পায়। কিন্তু এর সংগে যদি জ্বর থাকে, যদি বমি করে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

অনেক ধরনের সংক্রমণের প্রথম লক্ষণ মাথা ব্যথা। দাঁত ওঠার জন্যে শিশুর কখনও মাথা ব্যথা হয় না।

**পাতলা পায়খানা**—যদি জলের মত পাতলা পায়খানা করে শিশু, বিশেষতঃ যখন খুবই কম তার বয়স, তাহলে সংগে সংগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ORS সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। পাতলা পায়খানার সংগে অনেকটা জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায়—যার ফল মারাত্মক হতে পারে শিশুর পক্ষে। আবারও, দাঁত বেরুবার সংগে পাতলা পায়খানার কোন সম্পর্ক নেই।

জ্বর—খুব বেশি জ্বর, লেগে থাকা জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বিষম সংক্রামক অসুখগুলো ছাড়া সাধারণ কারণগুলো হল গলার বা কানের সংক্রমণ, অথবা সম্ভবতঃ মূত্র পথের সংক্রমণ, বড়দের মতই ছোটদেরও কখনো বা অল্প দিনের জন্য লাগাতার জ্বর থাকতে পারে—যাকে বলা হয় ফ্লু। দাঁত ওঠার জন্যে কখনো জ্বর হয় না।

## পেটের ব্যথা

যারা স্কুলে যায় এমন শিশুদের মাঝ পেটে মাঝে মাঝে ব্যথা প্রায়ই হতে দেখা যায়। ৯ জনের মধ্যে ১ জনের এরকম হয়, এদের বেলায় কোন কারণ বা অসুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবের জন্যে চিকিৎসক ডাক্তারও দরকার হয় না। এ ধরনের পেটে ব্যথা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় মাত্র। অবশ্য এর সংগে যদি শিশু বমি করে, কাহিল হয়ে পড়ে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল। ডানদিকে পেটে ব্যথার সঙ্গে বমি ও জ্বর থাকলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের কথা ভাবতে হবে, ডাক্তার দেখিয়ে নিতে হবে। অনেক সময় সংক্রমণ থেকে, ক্রমাগত কাশলে, বমি করলে, পাতলা পায়খানা করলে পেটে ব্যথা হতে পারে।

অন্য উপসর্গ—হঠাৎ আচ্ছন্ন হলে, এর সঙ্গে শরীর সাদাটে হলে, জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হলে বা তাড়াতাড়ি শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে, শ্বাস নেবার সময় নাকের ধারগুলো বা বুকের দেওয়াল ভিতরের দিকে ঢুকে গেলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। নিউমোনিয়া হলে শিশুর এসব লক্ষণ দেখা দেয়।

## অন্ত্রের পরজীবী সংক্রমণ ও তার প্রতিকার

৫০ এর বেশি বিভিন্ন ধরনের পরজীবী আছে—যারা মানুষের পেটের ভিতর—অন্ত্রের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে। এদের ৭টি শ্রেণী খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের প্রায়ই ভুগতে দেখা যায়। এগুলো হল :

(১) **গোলাকার কৃমি ( অ্যাসকারিস )** লম্বা, সরু, গোলাকার পেন্সিলের মতো। খাবারের মধ্যে দিয়ে মুখে যায়, ডিম ফোটে অন্ত্রে, লার্ভা অন্ত্রের দেওয়াল ভেদ করে রক্তের ভিতর দিয়ে ফুসফুসে যায়, সেখান থেকে শ্লোমনালী ও গলনালী দিয়ে অন্ত্রে ঢোকে। মেয়ে কৃমি রোজ দু'লাখ ডিম পাড়তে পারে, যা পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। উন্নয়নশীল দেশে বেশিরভাগ শিশুই আক্রান্ত হয়। পেটে ব্যথা হতে পারে, নিউমোনিয়া হতে পারে। সংক্রমণের ফলে লোক কখনো সখনো মারাও যেতে পারে। কৃমি মাঝে মাঝে পায়খানার সঙ্গে না বেরিয়ে মুখ বা নাক থেকে বেরিয়ে আসে। পায়খানা পরীক্ষা করলে জানতে পারা যায়, ডিম দেখে। অবশ্য যদি একটিই শুধু পুরুষ কৃমি থাকে, তাহলে পায়খানা পরীক্ষা করলেও জানা যায় না। এই কৃমির সংক্রমণের ফলে পৃথিবীতে প্রতি বছর মারা পড়ে ২০ হাজার লোক।

(২) **কুচো কৃমি ( থ্রেড ওয়ার্ম-এনটেরোবিয়াসিস )** আঙ্গুল বা নখে কৃমির ডিম লেগে থাকলে তা মুখে পুরলে মুখের মধ্যে যায়। ডিমগুলো থাকে চামড়ায় বা শিশুর পরিধেয় কাপড় চোপড়ে, মলদ্বারের আশেপাশে। ডিম ফোটে অন্ত্রে গিয়ে কিন্তু কৃমি অন্ত্রে বংশবৃদ্ধি করেনা—মেয়ে কৃমি এক ভাগের আট ইঞ্চি লম্বা মলদ্বারের কাছে নেমে এসে রাত্রে ডিম পাড়ে—১০০০০ ডিম পাড়তে পারে, তারপর মারা যায়। রাত্রে এর ফলে সংক্রমণ থাকলে মলদ্বারের কাছে বা শিশুদের যৌনাঙ্গে চুলকায়। তখন শিশুর আঙ্গুলে ডিম লেগে যায়, সেখান থেকে মুখে যায়। এক্ষেত্রে পায়খানা পরীক্ষা করলে রোগনির্ণয় হয় না। একটা সেলোফেনের কাগজ মলদ্বারে কিছুক্ষণ রাখলে সেটা তুলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করলে ডিম দেখা যায়।

(৩) **হুইপওয়ার্ম ( ট্রাইকিউরিস )** চাবুকের মত দেখতে বলে এই কৃমির এই নাম। এটাও গোলাকার। দু'ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। অন্ত্রের গায়ের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে রাখে। এদের বাসা সিকাম ও বৃহদন্ত্রের উপর অংশে। ডিম মুখে গেলে, সেখান থেকে পেটে যায়।

অল্প-স্বল্প সংক্রমণে কিছু হয় না, কিন্তু সংক্রমণ বেশি হলে শিশুর মলদ্বারের কিছুটা বেরিয়ে আসে অনেক সময়, পায়খাখানার পর জোর করে আবার তুলে দিতে হয়। পায়খানায় ডিম দেখে রোগ এবং কৃমি নির্ণয় করা যায়।

(৪) **হুকওয়াম´ ( অ্যানকাইলোস্টোমা )**—ছোট-গোলাকার কৃমি ১ সেমি লম্বা, হুকের মত দেখতে। এই কৃমি অন্ত্রের গায়ে লেগে থেকে রক্ত চুষে খায়। পায়খানার সঙ্গে ডিম বের হয়। স্যাঁতসেতে জমিতে ৫ দিনের মধ্যে লার্ভা বের হয়। তখন সে জমিতে খালি পায়ে গেলে পায়ের চামড়া ভেদ করে মানুষের শরীরের ভিতর ঢোকে। তিন দিনের দিন রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌছায় আর গোলাকার বড় কৃমির মতই সেখান থেকে অন্ত্রে আসে। এদের বাসা ক্ষুদ্রান্তের উপরের দিকে।

(৫) **ফিতে কৃমি ( টিনিয়া )** ফিতের মত দেখতে। ৫-১৫ ফুট লম্বা। তু'ধরনের সাধারণ ফিতে কৃমি ছড়ায় যথাক্রমে সংক্রামিত গোরু এবং শূকরের মাংস থেকে—সুসিদ্ধ মাংস খেলে এ রোগ হয় না। অন্য অনেক ধরনের হয়। ইঁতুরের ফিতে কৃমির সংক্রমণও হতে পারে। শিশুদের পায়খানা পরীক্ষা করলে ডিম দেখে চেনা যায়। পৃথিবীতে ৫ কোটি লোক বছরে এই রোগে ভোগে, বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ হাজার। সংক্রমণের ফলে পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কখনো কখনো শিশুরা নিজেরাই তাদের মলে ফিতে কৃমির খণ্ডাংশ দেখতে পায়।

একটা ধারণা আছে। শিশুদের পেটে আপনা আপনি কৃমি জন্মায়। ভুল ধারণা। কোন কৃমিই পেটে আপনা আপনি জন্মায় না। অনেকে বলেন ২।১ টা কৃমি পেটে থাকা ভাল। এটাও ভুল ধারণা। বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়।

(৬) আমাশয় ( **এণ্টামিবা হিসটোলিটিকা** ) এটা প্রটোজোয়া শ্রেণীর একটি এককোষী পরজীবী। মুখের ভিতর দিয়ে সংক্রমণ হয়

দূষিত খাবার জলের মাধ্যমে। সারা দুনিয়াতে বছরে ৪০ কোটি লোক আমাশয়ে ভোগে, মারা যায় ৩০ হাজার লোক।

(৭) জিয়ার্ডিয়া ( **জিয়ার্ডিয়া** ) এও এক ধরনের এককোষী পরজীবী। সংক্রমণের কায়দাও এক। শিশুদেরও হয়। লোক মারা না গেলেও পেটের নানা গোলমাল ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। এই রোগে পৃথিবীতে বছরে ভোগে ২০ কোটি লোক।

এসব পরজীবী সংক্রমণেরই চিকিৎসা আছে। তবে পরিবেশ উন্নয়ন না হলে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে পুনরাক্রমণ চলতেই থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এইসব পরজীবীর সংক্রমণ হয় মাটি থেকে, জল থেকে, খাবার বা মাংস থেকে। কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

- খেতে হবে বিশুদ্ধ জল।
- মলমূত্র ঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপসারণ করতে হবে।
- হাত বারে বারে ধুতে হবে, বিশেষতঃ খাবার আগে। নখ বড় যেন না থাকে। এবং আরও—
- ফলমূল ও শাকসবজী ভালভাবে ধুতে হবে।
- মাছি, আরশোলা, ইঁদুর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- মাংস খেতে হলে সুসিদ্ধ মাংস খেতে হবে।

### পশুপাখি থেকে শিশুদের কোন রোগ হয় কি?

এটা স্বাভাবিক যে শিশুরা পশুপাখি ভালবাসে, তাদের সঙ্গে খেলা করতে চায়। কিন্তু কোন কোন জীব রোগ ছড়ায়। খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়। আমাশয় জাতীয় বীজাণু—**স্যালমোনেলা** থেকে পশুপাখির বিষ্ঠার সঙ্গে এ ধরনের সংক্রমণ ঘটতে পারে—খাবারে বা জলে মিশলে সংক্রমণ হয়। শিশুকে কুকুরে বা অন্য পোষা জন্তুতে চাটছে—এটা ঠিক নয় কুকুর থেকে কোন কোন কৃমির সংক্রমণ হতে পারে। কোন কোন পরজীবী ঘটিত রোগ ( টকসোপ্লাসমোসিস ) হতে পারে—চিকিৎসা বা রোগনির্ণয় দুরূহ হয়। কুকুরের থেকে চামড়ার রোগ ( দাদ ) হতে পারে। কুকুরের কামড় থেকে, আগে থেকে ট্রিপল অ্যান্টিজেন না নিয়ে থাকলে

টিটেনাস হতে পারে। পাগলা কুকুর কামড়ালে অ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন না নিলে জলাতঙ্ক হয়।

কখনো কখনো শিশুর অ্যালার্জীর জন্যে দায়ী পোষা জীবজন্তু। জীবজন্তুর লোম হাঁপানির একটা অন্যতম কারণ। পাখির গায়ের নানা মাকড় বা পোকা শিশুর হাঁপানির জন্যে দায়ী হতে পারে।

বিড়াল ঘাঁটলে ডিপথেরিয়া হয় না—তবে বিড়ালে আঁচড়ালে এক ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে—যার নাম 'ক্যাট স্ক্র্যাচ ফিভার।' আঁচড়ানা থেকে রোগ আত্মপ্রকাশের সময় ১০—৩০ দিন। আঁচড়ানোর জায়গাটা একটু ফুলতে পারে। অন্য উপসর্গ—শরীর ম্যাজম্যাজ করা, সামান্য জ্বর এবং গ্রন্থিগুলি বড় হয়—বড় অবস্থায় থাকে, ১—২ মাস শিশুকে তেমন অসুস্থ মনে হয় না। কোন নিাদষ্ট চিকিৎসা নেই। কুকুরের প্রসঙ্গে যে সব অসুখের কথা বলেছি, বিড়াল থেকেও তা হতে পারে।

গিনিপিগ, খরগোশ ও বিড়াল হুপিংকফের মত এক ধরনের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এক ধরনের নিউমোনিয়া ছড়াতে পারে পাখি, বিষ্টার সংক্রমণে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা ছত্রাক ঘটিত অসুখ ছড়াতে পারে পাখিরা।

অনেক ধরনের জন্তু, যেমন ইঁদুর মানুষের মস্তিষ্কে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এক ধরনের যকৃতের সংঘাতিক প্রদাহও সৃষ্টি করতে পারে। নদী বা নালার জল সংক্রামিত হয় এদের বর্জ্য পদার্থ দিয়ে। সে সব জলে স্নান করলে শিশু এবং বয়স্করাও সংক্রামিত হয়।

## ম্যারাসমাস ও কোয়াসিয়রকর

আমাদের দেশের মত পৃথিবীর যেসব দেশে অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং সাধারণ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেই সব দেশের শিশুদের মধ্যে ম্যারাসমাস ও কোয়াসিয়রকর নামে দুটি রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষ লক্ষনীয়। অবশ্যই এই দুটি রোগের সঙ্গে দারিদ্র্যের অতি নিকট

সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া খাদ্যাভ্যাসের ত্রুটিও এদের অন্যতম কারণ। শিশুকে ঠিকমত মায়ের বুকের দুধ না দিলে অথবা মায়ের বুকের দুধে শিশুর আহারের পর্য্যপ্ত চাহিদা না মিটলে এই রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে।

এই দুটি রোগই অপুষ্টিজনিত এবং প্রোটিন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার অভাবেই ঘটে থাকে। ইংরাজীতে বলা হয় **protein energy malnutrition.** বা সংক্ষেপে PEM। এই অপুষ্টির অবস্থাকে যদি তার তীব্রতা অনুযায়ী একটা ক্রমপরিণত ধারা হিসেবে লক্ষ্য করা যায় তবে তার সুরুতে ম্যারাসমাস ও শেষে কোয়াসিয়রকর আর মাঝখানের অবস্থা ম্যারাসমিক কোয়াসিয়রকর।

মায়ের কোলে প্রথম সন্তানের পর যখম দ্বিতীয় সন্তানটি আসে তখন স্বভাবতই প্রথম সন্তান তার মায়ের বুকের দুধের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় আর এই বঞ্চনা থেকে যে রোগের উৎপত্তি তার নাম কোয়াসিয়রকর। আফ্রিকার লোকপ্রচলিত ভাষায় কোয়াসিয়রকর শব্দের অর্থ 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়'। দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে মাতৃস্তনচ্যুত প্রথম সন্তানের অপুষ্টিজনিত রোগকে বোঝাতেই কোয়াসিয়রকর শব্দের ব্যবহার চালু হয়। শিশুকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে কিংবা বুকের দুধের বদলে গরু বা ছাগলের বিকল্প দুধ জল মিশিয়ে শিশুকে খেতে দেওয়ার সময়ে যে অপুষ্টিজনিত রোগ-লক্ষণ প্রথম অবস্থায় দেখা যায় তাকে বলে ম্যারাসমাস। যখন শুধু বুকের দুধেই শিশুর ক্ষিদে সম্পূর্ণ মেটে না অথচ তাকে পরিপূরক শক্ত খাবার ধরাতেও দেরী হয়ে যায় তখনও তার ম্যারাসমাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই সময়ে ক্ষুধার্ত শিশু অপুষ্টির শিকার হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উদরাময় বা ডায়ারিয়ার কবলে পড়তে পারে। সাধারণত মায়েদের অজ্ঞাতবশত উদরাময়ে আক্রান্ত শিশুকে এতই স্বল্পাহারে রাখা হয় যে, পুষ্টির অভাবে শিশুর ম্যারাসমাস রোগ হতে পারে এবং ক্রমে তা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর খিদে থাকে না, তার মেজাজ খিটখিটে

হয়ে পড়ে, বয়সের তুলনায় তার উচ্চতা অনুযায়ী ওজন শতকরা ৬০ ভাগ কম হয়, তার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে যায় আর তার শরীর মেদমাংসহীন জীর্ণ অস্থিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। শিশুর ওজনের চার্ট থেকে যদি বোঝা যায় যে, তার বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে না তখনই অপুষ্টি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়তে পারে। প্রথম ধরা পড়লে পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থাই শিশুকে রক্ষা করতে পারে। ভিটামিন বড়ি বা ইন্‌জেকসন নয়।

## ॥ কান ও নাকের যত্ন ॥

শিশুদের কানে কোনরকম অসাবধানতায় দুধ বা জল ঢুকে গিয়ে কান পাকতে পারে। তাই শিশুকে বুকের দুধ দেওয়ার সময় কিংবা স্নান করাবার সময় সাবধান হওয়া উচিত। দুধ খাওয়াবার সময় শিশুর মাথার দিকটা শরীরের তুলনায় একটু উঁচু করে রাখতে হয় এবং খাওয়াবার পর তাকে কাঁধে নিয়ে পিঠ চাপড়ে হাওয়া বের করে দিতে হয়। না হলে নাকের পেছন দিক থেকে দুধ কানের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। আবার স্নান করানোর সময় শিশু খুব ছটফট করে। তাই তখন একজনে শিশুর মাথা ধরে রাখলে এবং আর একজনে আস্তে আস্তে জল ঢালতে থাকলে শিশুর নাক মুখ থেকে জল সহজে কানে ঢুকে যেতে পারে না।

এছাড়া আরও যে সব কারণে শিশুর কানপাকা রোগ হতে পারে তাদের মধ্যে শিশুর কান পরিষ্কার করার অতি উৎসাহে অভিভাবকদের শিশুর কান খোঁচানোর অভ্যাসের কথা প্রথমেই বলতে হয়। কানে ময়লা থাক বা না থাক অথবা কানের ভেতর ভালোভাবে দেখা যাক বা না যাক কান খোঁচানোর ফলে অনেক সময় কানের পাতলা পর্দায় আঘাত লাগে। কানের পর্দা ফেটে গিয়ে বীজাণু সংক্রমণ হতে পারে। বীজাণু সংক্রমন হলে কানপাকা হতে পারে।

শিশুর স্নানের জল যদি নোঙরা হয় বা শৌচাদি নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত পুকুরের জল দূষিত হয় তাহলে সেই জল কানে ঢুকে গেলে

ছত্রাকজনিত সংক্রমনে কান দিয়ে রস পড়তে পারে, কানে ব্যাথা বা কান ভারী হতে পারে। কানপাকার একটি কারণ শিশুর স্নানের জলের অপরিচ্ছন্নতা। শিশুরা খেলতে খেলতে নাকের ভেতর অনেক সময় ভাঙ্গা খেলনা বা টুকিটাকি জিনিস ঢুকিয়ে ফেলে। মার্বেল, রবার, পেন্‌সিলের টুকরো, চক, বোতাম, ফলের বীচি---পয়সা ইত্যাদি হরেকরকম জিনিস নাকের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলার পর অনেক সময় নাকের মধ্যে থেকেই যায়। বড়োরা যখন জানতে পারেন তখন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসটা বার করবার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো সময় আনাড়ি হাতে উল্টোপাল্টা চেষ্টার ফলে নাকে চোট লাগে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। ঠিক একইভাবে কানের তেতর ঢোকানো কোনো কিছুর টুকরো, পুঁতি ইত্যাদি অনভিজ্ঞ হাতে বার করতে গিয়ে কানের পর্দার চোট লাগতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য নেওয়াই ভালো।

অনেক সময় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নাক বা কান চুলকানোর অভ্যস আছে। এই চুলকানো থেকে নাক বা কানে ঘা হতে পারে এবং নাক বা কান দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। যে সব শিশুর পেটে ক্রিমি আছে তাদেরই এই চুলকানোর প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এই শিশুদের পায়খানা পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখানো দরকার। তাছাড়া শিশু যাতে চুলকাতে না পারে তার জন্যে তার হাতের নখ খুব ছোটো করে কেটে দিলে ভালো হয়।

যে সব শিশুর সর্দির ধাত আছে, তাদের রাতে ঘুমোনোর সময় মুখ একটু ফাঁক করে থাকতে দেখা যায়। তাদের নাকের সর্দি থেকে কানে শ্লেষ্মা জমতে পারে এবং তা থেকে তাদের কানপাকা হতে পারে। এই শিশুদের সর্দি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারিয়ে না তুললে নাক কানের ক্ষতি হতে পারে।

আরও একটা বিষয়ে প্রত্যেক বাবা-মা, অভিভাবক ও শিক্ষককে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কোনো কারণে শিশুর আচরণে বিরক্ত বা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু করা উচিত নয় যার ফলে শিশুর নাক-

কানের মত সংবেদনশীল অঙ্গের সামান্য ক্ষতি হতে পারে। শিশুর ওপর রেগে গিয়ে যদি কেউ শিশুর গালে আচমকা জোরে চড় মারেন তাহলে তাতে শিশুর কানেও আঘাত লাগতে পারে। অনেকক্ষেত্রে কানের আঘাত এমন গুরুতর হতে পারে যে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে কিংবা কানের ভেতরের সূক্ষ্ম স্নায়ু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পরিণামে শিশুর শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে কিংবা শিশু ক্রমে বধির হয়ে যেতে পারে। যে সব শিশুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তাদেরও মুখের ওপর মারা উচিত নয়। তাতে নাকে রক্ত পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায় এবং নাকের ক্ষতি হতে পারে।

যাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তারা যাতে নাক ঘনঘন না চুলকায়, রোদে বেশী ঘোরাফেরা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ডাক্তারকে দেখাতে হবে।

যে সব শিশুর এ্যালার্জি ( allergy ) থেকে সর্দি লাগার প্রবণতা বেশী এবং ঘন ঘন সর্দি হওয়ার জন্য যাদের কানের ভেতরেও পুঁজ বা ঘা হতে পারে তাদের ধুলোবালি ধোঁয়া বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা এবং যথেষ্ট ভিটামিনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। শিশু কানে ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করলে তার অস্থির বা অস্বাভাববিক আচরণেই তা প্রকাশ পায়। অভিভাবকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

## দাঁতের যত্ন

মুখের সৌন্দর্যের অনেকখানিই নির্ভর করে দাঁতের স্বাস্থ্যের ওপর। দাঁতের সাজানো সারি বা পংক্তির তুলনা করতে আমরা অনেক রকম উপমা দিয়ে থাকি। এই সুন্দর সাজানো দাঁতের সারির জন্য শৈশব থেকেই দাঁতের যত্ন নেওয়া দরকার। শিশুকে দাঁতের যত্ন নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে মা-বাবাকেই দাঁতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানতে হবে। দাঁতের স্বাস্থ্যচর্চার প্রথমিক নিয়মগুলো শিশুকে একবার ধরিয়ে দিতে পারলে তার দাঁতে যত্ন সে নিজেই নিতে পারবে। মনে

রাখতে হবে দাঁতের ক্ষতি হলে তার স্বাভাবিকতা আর কোনোভাবেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বোধ হয় দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে না পারার পরিণাম সম্পর্কে আমদের আফশোসের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি ও ভিটামিন-সি দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী। ক্যালসিয়াম দাঁত মজবুত রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন-ডি দাঁতের গঠনে ক্যালসিয়ামকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। ভিটামিন-সি দাঁতের মাড়ি শক্ত ও সুস্থ রাখে। এই তিনটি খাদ্য-উপাদান শিশু যখন মায়ের গর্ভে তখন থেকেই শিশুর জন্য মায়ের খাদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার। কারণ গর্ভস্থ সন্তান মায়ের খাদ্য থেকেই তার শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে এই তিনটি পুষ্টি উপাদান নিয়মিত দিয়ে যেতে হবে। দুধ, দুধের তৈরী খাদ্য, সবুজ শাকসব্জি, ডিমের কুসুম ও মেটে থেকে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। ফলের রসে আছে ভিটামিন-সি।

দাঁতের যত্ন বলতে কিন্তু শুধু দাঁতের স্বাস্থ্যর কথাই বোঝায় না। মাড়ি সমেত মুখবিবরের স্বাস্থ্য রক্ষাই দাঁতের যত্নের মূল কথা। শিশুকে একটু একটু করে শক্ত খাবার চিবিয়ে খাওয়ানো অভ্যাস করাতে হবে। তাতে তার মাড়ি শক্ত হবে, দাঁতের বিন্যাস ঠিকভাবে গড়ে ওঠবে। দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন স্থায়ী দাঁত ওঠার জন্য অপেক্ষা না করে শৈশব থেকেই শিশুর দাঁতের স্বাস্থ্যের প্রতি মা-বাবাকে যত্নশীল হতে হবে।

আমাদের মত উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিশুদের দাঁতের ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণ কথায় আমরা এই ক্ষয়রোগকে দাঁতে পোকা লাগা বলে থাকি। অবশ্য সত্যসত্যিই কোন পোকা কখনো দাঁতে থাকে না। শর্করা জাতীয় কোনো খাবার, বিশেষ করে চিনি, গুড়, টফি, লজেন্স, মেঠাই ইত্যাদি বেশী খেলে এ জাতীয় খাবারের অবশিষ্ট দাঁতের ফাঁকে বা মাড়িতে জমে একধরনের ক্ষয়কারী বীজাণুর জন্ম দেয়।

তার ফলেই দুরবস্থা। তাই এই সব খাবার শিশুকে বেশী না দেওয়াই ভালো। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে খাদ্য কণাগুলো যেন কোনো ক্রমেই দাঁতের ফাঁকে জমে থাকতে না পারে, কারণ দাঁতের ফাঁকে জমে-থাকা খাদ্যকণাগুলো থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। দাঁতের ওপর এনামেলের যে আবরণ থাকে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফ্লুরাইড নামে এক ধরণের ধাতব লবণ এই আবরণ রক্ষা করে। এনামেল নষ্ট হয়ে দাঁতের ফাঁকে পাথুরি জমতে পারে আর তার ফলে নানারকম ব্যথা-যন্ত্রনা ও দুর্ভোগ হতে পারে।

যে কোনো খাবার খাওয়ার পর ভালো ভাবে কুলি করে মুখের ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতে হবে, যেন দাঁতের ফাঁকে বা মাড়িতে খাদ্যের অবশেষ লেগে না থাকে। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে দাঁতের অনিষ্টকারী বীজাণুরা দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্য কণাগুলোর সংস্পর্শে দাঁতের ক্ষতি করার বেশী সুযোগ পায়। তাই রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে দাঁত মাজা ও মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা একান্ত দরকার।

ব্রাস করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্রাস যেন দাঁতের ওপর সারির বেলায় ওপর থেকে নীচে এবং নীচের সারির বেলায় নীচের থেকে ওপর দিকে আস্তে আস্তে চালানো হয়। আড়াআড়ি ভাবে ও খুব চেপে জোরে জোরে দাঁত মাজলেই দাঁত পরিষ্কার ঝকঝকে হবে, এ ধারণা ভুল।

একই ব্রাস দুজনের ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রাসের বদলে দাঁতনও ব্যবহার করা যেতে পারে ; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, মাজবার পদ্ধতি যেন এক থাকে, অর্থাৎ আগে যেমন বলা হল সেই ভাবে যেন মাজা হয়। মাজবার সময় কোনো রকম আঘাত বা খোঁচা লেগে মাড়ি বা মুখের মধ্যে ক্ষতি না হয়। ফল বা কাঁচাসব্জি চিবিয়ে বা কামড়ে খাওয়া ভালো। তাতেও দাঁত পরিষ্কারের কাজ করে এবং দাঁত ও মাড়ি শক্ত করে।

দাঁতের বা মাড়ির কোনো রকম ব্যথা-যন্ত্রণা বোধ হলে দেরী না

করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবহেলা করলে কিংবা নিজেদের মতে চললে অথবা হাতুড়ে চিকিৎসার সাহায্য নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

## ॥ চোখের অসুখ ॥

যত্ন ঃ চোখের জন্মগত ত্রুটি ছাড়া অন্য যে সমস্ত কারণে শিশুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে তা প্রতিরোধ করা যায়—যদি শৈশবে চোখের যত্ন নিতে ও সময়ে সাবধান হতে অবহেলা করা না হয়। সাধারণত যে প্রতিকূল অবস্থায় শিশুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে তা হল, (ক) চোখে বীজাণুর সংক্রমণ ( infection ), (খ) পুষ্টির অভাব (গ) চোখে আঘাত এবং (ঘ) হাতুড়ে চিকিৎসা বা টোটকা। এছাড়া কোনো গুরুতর অসুখে মস্তিষ্কের প্রদাহ থেকে দৃষ্টিহানির আশঙ্কা ঘটতে পারে।

বীজাণু সংক্রমণ জনিত প্রদাহ থেকে চোখের নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। নবজাত শিশুর চোখ প্রতিদিন পরিষ্কার জলে আস্তে আস্তে ভালোভাবে ধুইয়ে দিতে হবে। চোখে যাতে পিঁচুটি জমতে না পারে এবং ধুলোবালি লাগতে না পারে তা দেখতে হবে। চোখের পক্ষে ক্ষতিকর বীজাণু এই অপরিচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়েই চোখে প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে। অপরের ব্যবহার করা তোয়ালে, গামছা বা রুমাল দিয়ে শিশুর চোখ মোছানো উচিত নয়। চোখে কিছু পড়লে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুইয়ে দিতে হবে; তাতে উপকার না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শিশুর চোখে বাজারের সুর্মা কাজল বা ঐ জাতীয় প্রলেপ না লাগানোই উচিত। 'চোখ-ওঠা' যার সাধারণ উপসর্গ হল, চোখ লাল হওয়া, চোখ দিয়ে জল পড়া, ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া ইত্যাদি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ইংরাজীতে এর conjuctivitis নামও বেশ প্রচলিত। এই সব উপসর্গ দেখা দিলে শিশুর চোখ দুটি পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বার কয়েক ধুইয়ে দিতে পারলে

অবস্থার তীব্রতা অনেকটা কমে যেতে পারে; চোখে কোনো মলম লাগানো বা ড্রপ দেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। চোখে যাতে কোনো রকম সংক্রমণ না ঘটে সেই জন্যে চোখকে এই সময়ে বাইরের ধুলোবালির সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করতে হবে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করার জন্যে শিশুদের মধ্যে আরও একটি চোখের অসুখ বেশী দেখা যায়। তার নাম ট্রকোমা। যদিও আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব তেমন নেই তবে এই রোগ হলে দৃষ্টিহানির মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে।

শিশুর খাদ্যে যথেষ্ট পুষ্টি না থাকলে, বিশেষ করে vitamin A নামের খাদ্যপ্রাণ বা পুষ্টি উপাদানটির অভাব হলে শিশুর দৃষ্টিশক্তির ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে। vit A-এর অভাবে শিশু রাত্রিবেলা চোখে দেখতে পায় না। এটি এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যপ্রাণ যার অভাবে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে শিশু-অন্ধত্বের এটি একটি অন্যতম কারণ। vit A-এর অভাবে keratomalacia বলে এক ধরনের রোগ হয় যাতে প্রথমে চোখের কর্ণিয়ার চারপাশে মাছের আঁশের মত এক ধরনের সাদা দাগ পড়ে এবং পরে কর্ণিয়া গলে গিয়ে শিশু অন্ধ হয়ে যায়। প্রথম থেকেই শিশুর খাদ্যে vit A-এর যোগান ঠিকমত বজায় রাখলে শিশুকে এই শোচনীয় পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করা অবশ্যই সম্ভব।

সন্তান যখন মাতৃগর্ভে তখন মায়ের খাবারে যদি vit-A-র ঘাটতি হয় তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব শিশুর চোখের ওপর পড়তে পারে। গর্ভকালে মায়ের শরীরে শিশুর জন্য অন্যান্য পুষ্টি-উপাদানের সঙ্গে vit A মজুত থাকে। এই মজুত ভাণ্ডারে টান পড়লে জন্ম থেকেই শিশুর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে পারে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিন মায়ের বুকের দুধে হলদে আটা-আটা এক রকম পদার্থ নিঃসৃত হয়; একে বলে কলোস্ট্রাম (colostrum)। এই কলোস্ট্রামে প্রচুর vit 'A'-এ থাকে যা

শিশুর পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এটি শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর মনে ক'রে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে শিশুকে vit 'A'-র স্বাভাবিক উৎস থেকে বঞ্চিত করা হয়।

শিশুরা ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খেয়ে থাকে। এই সময়ে মায়ের খাদ্যে যদি vit-'A' পর্য্যাপ্ত না থাকে তাহলে তাঁর বুকের দুধেও এই vit 'A'-র টান পড়ে। সেই দুধ খেয়ে শিশুর vit 'A'-র অভাবজনিত অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

এছাড়া, কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা বা অন্ধবিশ্বাস থাকার ফলে এখনও মায়েরা কোনে কোনো সমাজে শিশুদের জন্য vit'A'-সমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে অনেক রকম বাদ-বিচার করে থাকেন। পরিণামে শিশুদেরই তার ফল ভোগ করতে হয়।

সবুজ শাকপাতা যেমন, পালংশাক, পাকা বা হলুদ রঙের ফলমূল যেমন পাকা পেঁপে, গাজর, পাকা আম এবং দুধ ও ডিমে vit 'A' যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শিশুদের vit 'A'-র বিশেষ তরল মিশ্রণ খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে।

গৃহস্থালীর কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত বিপজ্জনক আসবাবপত্র শিশুর নাগালের মধ্যে থাকলে তা থেকে অসাবধানতাবশত আঘাত লেগে শিশুর চোখের ক্ষতি হতে পারে। ছুরি, কাঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারালো যন্ত্রপাতি শিশুদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে হবে। শিশুরা স্বভাব চঞ্চল। তাদের খেলনাপত্র যেমন ডাংগুলি, তীরধনুক ইত্যাদি নিয়ে খেলার সময় তাদের নিজেদের কিংবা বন্ধুদের চোখে ঐ সবের কোনোটির আঘাত লাগতে পারে। আতস বাজী, পটকা ইত্যাদি থেকেও চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাই একটু অসাবধানতার ফলে শিশুদের চোখের ওপর থেকে পৃথিবীর আলো যাতে চিরকালের মতো মুছে না যায় সে দিকে অভিভাবকদেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

## ডাক্তারের পরামর্শ কখন দরকার

(১) সদ্যজাত শিশুর চোখ দিয়ে জল বা পিঁচুটি অথবা দুই-ই পড়লে।

(২) বারবার আঞ্জনি হলে।

(৩) চোখ মাঝে মাঝে লাল হলে বা চুলকালে।

(৪) খুব কাছে নিয়ে বই পড়লে বা স্কুলের বোর্ডের লেখা পড়তে না পারলে।

(৫) পড়শুনা করার সময় মাথাব্যাথা করলে।

(৬) কখনও কখনও ঘোলাটে রঙ দেখা কিংবা আলোর চারপাশে রামধনুর মত রঙ দেখা গেলে।

বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো, পেটে কৃমি থাকলে তার চিকিৎসা করানো উচিত এবং সময়ে চশমা নেওয়ায় অবহেলা করা উচিত নয়।

## মায়েরা একটু ভাবুন

একটি শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন দেখতে হবে, সে যেন ঠিকমত মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠে। শিশুর স্বাস্থ্য হচ্ছে শিশুর বড় হয়ে ওঠার প্রাথমিক চাবিকাঠি। কিন্তু এর সঙ্গে রয়েছে নানা সমস্যা, কোনটা ব্যক্তিগত কোনটা পরিবারগত, আবার কোনটা বা আঞ্চলিক, কোনটা বা সামাজিক। একটি শিশু কেমন করে কী পরিবেশে বড় হচ্ছে, তা' দেখে একটা জাতিকে বিচার করা যেতে পারে। অবৈজ্ঞানিক নানা ধ্যান ধারণা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যেরও পথ রোধ করে দাঁড়ায়, এমন কি তার মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। আমাদের মায়েদেরই এ বিষয়ে সজাগ হবার, সংঘবদ্ধ হবার সময় এসেছে।

এখন বেশিরভাগ শিক্ষিত পরিবারে শিশুর সংখ্যা সীমিত। কিন্তু একটা অদ্ভুত মানসিকতার শিকার আমরা প্রায় সকলেই—ছেলে হলে যতটা আনন্দে ডগমগ হই—মেয়ে হলে নয়। হয়ত সামাজিক

অবস্থা এর জন্যে দায়ী—কিন্তু কেন এ মানসিকতা থাকবে? ছেলে মেয়ে তুল্যমূল্য কেন হবে না? সমাজ বদলাবার ভার শুধু সমাজপতিদের নয়, আসলে সেটা সাধারণ মানুষেরই হাতে। প্রথম সন্তান মেয়ে, অতএব ছেলে চাই—এই যুক্তিতে পরপর মেয়েই জন্মে যায় যখন, তখন পরিবার পরিকল্পনা যেমন মাঠে মারা যায়, তেমনই আমাদের মানসিক দেউলেপনাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তবে দিনকাল নিশ্চয়ই বদলাচ্ছে। এমন অনেক বন্ধু-বান্ধব পরিচিত পরিবার আছেন, যাঁদের একটিই সন্তান—এবং সে সন্তান মেয়ে সন্তান এবং তুল্যমূল্য লাভ করছে সেই ভাগ্যবতীরা। সমাজ যে বদলাচ্ছে, এ তার এক চিত্র।

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে এবং গর্ভ মোচনের জন্যে এখনো নানা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যার পরিণামে গর্ভবতীর মৃত্যুও হতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগে এ অভিশাপে কেন আমাদের জড়িয়ে রাখবে নাগপাশে? সন্তান আসবে কি না, সন্তান ধারণ যিনি করবেন, তাঁরই উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা সর্বাগ্রগণ্য। তবে, বেছে নিতে হবে আধুনিক নিরাপদ পথ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের। এ বিষয়ে সরকারী সহায়ক প্রকল্প আছে, কোন দালালের শিকার হয়ে পড়লে সমূহ ক্ষতি।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারেও দেখা যায়, অবৈজ্ঞানিক পন্থা কেউ কেউ গ্রহণ করেন, ফলে তার খেসারত দিতে হয়। এক সহকর্মীর কথা জানি, যিনি পরিবার পরিকল্পনার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন অন্যতর চিকিৎসা নামে কিছু অবৈজ্ঞানিক পন্থা; এর ফলে তাঁর পরিকল্পনার ইমারৎ ভেঙে পড়েছিল।

এখন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, এমন কি শ্রমিক কৃষকের ঘরেও শিশু পালন নিয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিবার তো প্রায়শই মা-বাবা-শিশুকে নিয়ে। মা-বাবা দুজনেই যেখানে কাজ করতে চলে যান, শিশু পালনে সেখানে বেশ সমস্যা দেখা দেয়, ভাল ক্রেশ বা মা বাবার কাজের সময়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কেন্দ্র

গড়ে ওঠেনি, অথচ তার দরকার খুবই। এখন শিশুর বয়স হতে না হতেই শিশুকে নার্শারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কে তাকে পৌঁছে দেবে, কে আনবে, এ এক সমস্যা। অনেক সময় নির্ভর করতে হয় পরিচারিকার উপর। এখন লোক রাখার ক্ষমতাও কমছে। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন যেমন শিশুকে সঙ্গ দিতে পারে, তেমন কি অন্য কারুর পক্ষে সম্ভব? অনেক অঘটনও ঘটে। একটি ছোট মেয়ে বারবার প্রতিবাদ জানাতো তার মায়ের কাছে "ভোলার সঙ্গে আমি কিছুতেই যাবো না।" এছাড়া শিশু রক্ষণাবেক্ষণেরও ফাঁক-ফোঁকর আছে। এমন অভিযোগও পাওয়া যায়। শিশুকে মাদক দ্রব্য খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

ফ্যাসন হয়েছে আজকাল শিশু অবস্থাতেই ছেলেমেয়েদের হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া। ভেবে দেখা দরকার, এর কতটা মা-বাবার নিজের স্বার্থের জন্যে, কতটাই বা শিশুর ভালর জন্যে। একথা তো অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে, মা-বাবার কাছে বড় হলেই শিশুর সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক ধরন এবং প্রবণতাটা বেশি—সুখ দুঃখ লড়াই জয় পরাজয় সে ভাগাভাগি করে নিতে পারে, মা বাবার স্নেহ আবেগ অনুভূতি আদেশ শাসনে সে জড়িয়ে থাকে, একটা কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে তাকে বড় হতে হয় না, যেখানে লেখাপড়ায় কিছুটা ভাল ফল কেউ কেউ করলেও অনেকেই হয়ে পড়ে স্বার্থপর, সমাজের সমস্যা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানহীন, যেন গাছের একটি শাখা কেটে লাগানো হয়েছে অন্য মাটিতে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু সেটা নিয়ম নয়—বিশেষ করে শিশুদের বেলায়।

পরিবারে একসঙ্গে থেকেও কিছু যে কুফল নেই এমন নয়। বাবা মা বা অভিভাবকদের ঝগড়া-ঝাটি, বাদ-বিসংবাদ, স্বার্থ চিন্তা এ সবই শিশুমনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কুসংস্কারের পায়ে কত মূল্যবান শিশুর জীবন বলি দিয়েছি আমরা। নবজাতকের নাড়ী কাটার পর গোবর লেপার রেওয়াজ চালু ছিল বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ফলে কত শিশু, কত মা মারা গেছেন

ধনুষ্টঙ্কারে। এখনো দেখা যায়, শিশুকে কুকুরে কামড়ালে ঝাড়ফুঁকের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, পিঠে থালা বসানো হয়, কিম্বা জনডিস হলে গলায় মালা ঝোলানো হয়। এমন কি কোন শিশু যদি হারিয়ে যায়, তাহলে পুলিশের কাছে না গিয়ে ছোটে অনেকে ফকিরের কাছে, সে শিশুর সন্ধান জানতে! শিশুকে যখন বাইরে পাঠানো হয়, তখন অনেক মা তার কড়ে আঙ্গুলটি কামড়ান, সামান্য, কপালের পাশে কাজলের ফোঁটা দেন, যাতে অশুভ শক্তির নজর না পড়ে শিশুটির উপর। এতে কীভাবে অশুভ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব? এবং শিশু তো ফুলেরই মত—এক পাষণ্ড ছাড়া কে তার উপর অশুভ দৃষ্টি দেবে? কে তার ক্ষতি করতে চাইবে?

কতকগুলো খারাপ অভ্যাস হামেশাই চোখে পড়ে—এখনও। শিশুর চোখের কোণে কাজল লেপা। চোখের এতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বীজাণুঘটিত একটা অসুখে চোখ জুড়ে যায় অনেক শিশুর —পিচুটি পড়ে। এর দিকেও মায়ের সঠিক নজর যায় না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত সঙ্গে সঙ্গে। চোখ ট্যারা হলে শিশু অবস্থাতে ব্যবস্থা নিলে অনেক সময়েই প্রতিরোধ করা যায়, ট্যারা চোখে শিশু কম দেখে বা দেখেই না—এটার কিছুটা পূরণ করা যায়। কোন তুকতাক ঝাড়ফুঁকে এসব সারে না। আরও মারাত্মক ব্যাপার আছে —চোখে আজেবাজে অনেক কিছু লাগানো হয় কবিরাজীর নামে—যেমন আকন্দপাতার রস প্রভৃতি—চোখের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

শিশুর খুব জ্বর হলে তড়কা হয়। অন্য অসুখের লক্ষণ হিসাবেও তড়কা দেখা দিতে পারে। এটা ভূতের বা অপদেবতার ভর নয় শিশুর উপর। ওঝা বা ফকিরের কেরামতিতে সারে না। কিছু গুণাগার দেওয়াই সার হয়।

খুব জ্বর হলে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অনেক মা জল দিয়ে শিশুর মাথা ধোয়াতে পর্যন্ত চান না। অথচ এমন সময় ঠাণ্ডা জলে সারা গা স্পঞ্জ করে দিলে উপকার পাওয়া যায়—জ্বর নেমে আসে। মাথায় গায়ে

জ্যাবজেবে করে সরষের তেল লাগানো, এতেও শিশুর শরীরের ক্ষতি হয়। তবে এ-ডি অয়েল ম্যাসেজ অবশ্যই উপকারী।

অনেক সময় শিশুকে ভয় দেখানো হয়ে থাকে, তার বায়না থামানোর জন্যে, তার কান্না রোধ করার জন্যে, বা এমনিতেই। ভয় দেখানো হয়ে থাকে দেব দেবীর, দত্যিদানোর, ভূত প্রেতের। ভয় মনে বাসা বাঁধে, বহু দূরপ্রসারী এর প্রভাব, শৈশব কৈশোরের অতীতেও তার জের টানতে হয়, এমনকি পরবর্তী জীবনেও, পরিণতিতে ভীরুতা ভয়, আতঙ্ক, অস্থিরতা।

আরো দেখা যায়, শিশুদের উপর যেন আমরা নির্ভর করতে পারি না। তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারেও এই সময় থেকেই সাহায্য করতে হবে। তাকে সম্মান দিতে হবে, দিতে হবে তার প্রাপ্য মর্যাদা। সে যেন ভাবতে পারে, সে অবাধ ভাবে বেড়ে উঠছে, কোন বাধার প্রাচীর যেন সে দেখতে না পায়। অবশ্য বিপথগামী হলে, অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে সমঝে দেবার দায়িত্বও মা-বাবা, পরিবার পরিজনদের। সেও যেন পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ জীব, এবং কারুর থেকে কম নয়, এটা যেন সে বুঝতে পারে। হীনমন্যতায় যেন আক্রান্ত না হয়—এমন ব্যবহার যেন তার সঙ্গে না করা হয়, যাতে সে নিজেকে নীচ ভাবে, দীন ভাবে, নিজেকে ছোট করে দেখতে শেখে।

আরও কতকগুলো ক্ষতিকর এবং অবৈজ্ঞানিক অভ্যাসের কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে।

ধরা যাক মুখে চুষিকাঠি দেবার কথা। কত ধরনের, কত বাহারের। আবার প্লাষ্টিকের বা রবারেরও আছে। বাচ্চাদের মুখে সব সময় দেওয়া থাকে, চুষেই চলেছে, ছাড়াতে গেলেই কাঁদে, বাধা দেয়। এতে প্রথম কথা, নোংরা ধূলো বালি পেটে যায়, পেটে যায় নানা বীজাণু—সংক্রমণ হয়, পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর পেট ফোলে বাতাস খেয়ে, অন্য কিছু খেতে চায় না। তা ছাড়া প্ল্যাষ্টিক বা রবারের সংস্পর্শে এসে মুখের ঘা বা অ্যালার্জিও হতে পারে।

এইরকম একটি অভ্যাস বোতলে দুধ খাওয়ানো, যার মুখে লাগানো

থাকে রবারের নল। বোতল ঠিকমত পরিষ্কার হয় না, দুধ হয়ত অনেকক্ষণ থেকেই যায়। রবারের মুখে জমে ধূলা-ময়লা, বসে মাছি। এর থেকে ঝিনুক দিলে ভাল—তবে সময় কই এখন অত ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ানোর! এই চুষিকাঠি ও বোতল ধরিয়ে শিশুকে মিথ্যাই স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই আমরা।

পাতলা পায়খানা হলে সাগুবার্লি দেওয়া আরেকটা মারাত্মক অভ্যাস। ঐ সময় জলের চাহিদা তো মেটাতেই হবে ওরাল রিহাইড্রেশন সলুইসন ( ORS ) এর সাহায্যে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে বিস্তারিত। তা ছাড়াও শিশু স্বাভাবিক যা খায়, তাই খাওয়াতে হবে, বিশেষ করে দুধ। ওষুধ না হলেও চলে, খাবার না হলেই বিপদ। শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে শুরু করে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত যে শিশু সে আবার নানারকম সংক্রমণে ভোগে। একটা চক্র চলতে থাকে এইভাবে।

গ্রাইপ ওয়াটার আমরা কে না খেয়েছি? কিন্তু আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে, এটা শিশুর তথাকথিত পেট মোচড়ানো ভালো তো করেই না, বরং ক্ষতি করে তার স্বাস্থ্যের। গ্রাইপ ওয়াটার নয়, শিশু তার বদলে চায় একটু ভালবাসা, আদর, যত্ন। দেখবেন, গ্রাইপ ওয়াটার না দিলেও তার কান্না তখন থেমে যাবে।

টন টন টনিক ও ভিটামিন দিয়েই আমরা ভাবি শিশু চড়চড় করে বাড়বে। অহেতুক টাকা খরচ হয় এতে, বরং তার বদলে শিশুকে পুষ্টিকর খাবার কিনে দেওয়া ভাল। দরকার না থাকলে ভিটামিন দিয়ে হবেটা কি—সব বেরিয়ে যাবে প্রস্রাবের সঙ্গে। আরও একটা মারাত্মক ব্যাপার দেখা যায়, শিশুদের ক্ষিদে লাগার জন্যে অনেক ওষুধ বের হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে থাকে এনজাইম, অনেক সময় অ্যালকোহল। অ্যালকোহল প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করতে পারে শিশুর স্বাস্থ্যের, তার মস্তিষ্কের। অ্যানাবলিক স্টেরয়েড, অ্যান্টিহিসটামিন প্রভৃতি অনেক সময় দেওয়া হয় শিশুদের বৃদ্ধির জন্যে যা ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত

করতে গিয়ে আকছার অ্যান্টিহিস্টামিনিক ট্যাবলেট খাওয়ানোর ফলে শিশুর বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বেটে হয়ে যায়, এমনও দেখা গেছে।

এদিকে শিশুকে শুধু ননীর পুতুল করে রাখলেই কি চলবে ? তাহলে তার শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবে কী করে ? গরমেই যদি তার গায়ে ২।৩ টা জামা চাপানো থাকে, তখনো যদি গরম জল দিয়ে স্নান করাতে হয়, তাহলে অহরহ তার ঠাণ্ডা লাগবেই। একটু জ্বর হতে না হতেই অমনি একগাদা ওষুধ, বৈজ্ঞানিক নয়, স্বাস্থ্যপ্রদও নয়। ১০২—১০৩°F এর উপর জ্বর উঠলে মাথা ধোয়াতে হবে ঠাণ্ডা জলে, সারা গাও ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জ করাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্বর নামছে। মাথায় বরফ দেওয়া যেতে পারে, বরফ পাওয়া গেলে। জ্বর খুব বেশি উঠলে গা ঠাণ্ডা জলে ডোবাতেও পারা যায়। এইভাবে জ্বর জনিত তড়কা প্রতিরোধ করাও সম্ভব।

জ্বর হলেই বা কোন সংক্রমণ হলেই কি শিশুকে একেবারে শয্যাশায়ী করে রাখতে হবে ? এর কোন মানে হয় না, কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিও নেই, অবশ্য ব্যতিক্রম আছে কয়েকটি ক্ষেত্রে—হ্যাবা হলে, পলিওমায়েলাইটিস সন্দেহ হলে বা রিউম্যাটিক ফিভার হলে প্রথম দিকে। বিছানায় আটকে রাখলে শিশু 'বোর' হয়ে যাবে, রাতের ঘুমও কম হবে। তেমনিই জ্বব হলে বা শিশু যেখানে ভীষণ ঘামছে সেখানে স্নান না করানোরও কোন যুক্তি নেই। পীড়িত শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় কি ? নয় কেন ? তবে বৃষ্টি বাদলার দিনে, বেশী শীত পড়লে শিশুকে বাইরে নিয়ে গেলে সর্দি হয়, সাবধানে নিয়ে যেতে হবে। পীড়িত হলে শিশুকে খেলনা দিতে পারা যায় তার খেলার জন্যে, মা বাবাকে কিছুটা সময় কাটানো উচিত শিশুর সঙ্গে। বিছানা ভিজানো আরেক রোগ। এতে মায়ের মুষড়ে পড়লে চলবে না। শিশুকে কোন মতেই যেন তিরস্কার করা না হয়। শাস্তি দেওয়া না হয় বা শিশুর সামনে যেন দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করা হয়, বা শিশু যেন বুঝতে না পারে যে মা তার উপর বেজার

হয়েছে। আর কোষ্ঠকাঠিন্য একটু আধটু যদি হয়ই, ক্ষতি নেই, ২—৩ দিন না পায়খানা করলেও কিছু যায় আসে না।

ছোট শিশুরা অনেক সময় হাঁপানিতে ভোগে। এ হাঁপানি বংশগত নাও হতে পারে। একটা বড় কারণ হতে পারে সিগারেটের ধোঁয়া। মায়েদের এ ব্যাপারেও একটু সজাগ হতে হবে। শিশুর পিতাও যদি সময়ে সতর্ক না হন, তাহলে তাঁকে সাবধান করার দায়িত্ব শিশুর মায়েরই। এই 'পরোক্ষ ধূমপান' শিশুর ছোট ফুসফুসের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। ধূলা, ধোঁয়া, অবার্জনাস্তূপ, কালিঝুলি এসব নিয়েও একই কথা। অন্যদিকে পরিপাটি সাজানো পরিবেশ শিশুর মনে আনন্দ জাগায়, তার পরমায়ু উজ্জ্বল হয়।

মানব সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল শিশু। মানব সম্পদের বিকাশ এবং উন্নয়ন যদি করতে হয়, তাহলে সব আগে দরকার শিশু-সম্পদের বিকাশ এবং উন্নয়ন। যে জাতি এ বিষয়ে যত সজাগ, সে জাতি তত উন্নত।

———

